দা'য়ী-এ ইসলাম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কালিম সিদ্দিকী সাহেব (দা.বা.)-এর আত্মজীবনীমূলক একান্ড়সাক্ষাৎকার

এই সাক্ষাৎকারটি মাসিক আরমুগানে মে ও জুন ২০১০ইং প্রকাশ হয়

সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন তরুণ আলেম নিবিষ্ট দা'য়ী মাওলানা উমর নাসেহী নদভী। এই সাক্ষাৎকারটি আমাদের আলোর পথে সিরিজ-৪ এ প্রকাশিত হয়েছে। ২১ ফেব্রুয়ারি-২০১০ইং হযরত মাওলানা কালিম সিদ্দিকী সাহেব দা.বা. এর বাংলাদেশে আগমন উপলক্ষে মুরুব্বিদের পরামর্শে, বিশেষত হযরত মাওলানা সালমান সাহেব দা.বা. এর নির্দেশে এই সাক্ষাৎকারটি পৃথক একটি বই আকারে প্রকাশ করা হলো।

অনুবাদক

ওমর নাসেহী : দীর্ঘদিন থেকে বন্ধুদের পীড়াপীড়ি– আপনার বাল্যকালের অবস্থা, বুযুর্গদের সাথে আপনার সম্পর্ক; অতঃপর দাওয়াতের সাথে সম্পৃক্ততা প্রভৃতি বিষয় যেন গ্রন্থবদ্ধ করা হয়। আপনি যদি এ বিষয়ে অনুমতি দান করেন তাহলে আমরা সকলেই উপকৃত হবো।

মাওলানা সিদ্দিকী : আমার মতো একজন অযোগ্যের জীবন-বৃত্তান্ড় জেনে তোমাদের লাভ কী? তাছাড়া বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রসঙ্গে আমার জীবনের নানা বৃত্তান্ড়ও বলে থাকি। আর তুমি তো আমার পরিবারেরই একজন সদস্য। এসব বিষয় তো তোমার জানাই আছে।

প্রশ্ন : স্মৃতির পরিবর্তে আপনার মুখ থকে পুনরায় শুনতে পরলে খুবই ভালো লাগবে। প্রথমেই আপনার জন্ম, বাল্যকাল এবং বংশ সম্পর্কে কিছু জানতে চাই।

উত্তার : হ্যাঁ খুবই ভালো লাগে, যখন আমি আমার প্রতি করুণাময় প্রভুর অসামান্য অনুগ্রহের কথা আলোচনা করি, তখন মনে হয় আমার আল-াহ এই পাপী বান্দার প্রতি জন্ম বরং জন্মেরও আগে থেকেই তাঁর করুণার অবিরাম বর্ষণের সূত্রপাত করেছেন। এই অধম যখনই তার বড়দের খেদমতে আবেদনপত্র পেশ করে তখন ঠিক নিজেকে এই কবিতার প্রতিচ্ছবি মনে হতে থাকে–

لکھا ہےداور محشر نے میری فرد عصیاں پر
یہ وہ بندہ ہے جس پر نازؔ کرتا ہے کرم میرا
কপালে আমার লিখে দিয়েছেন ন্যায়বিচারক হাশরপতি
এ বান্দা আমার– যাকে নিয়ে গর্ব করে মোর অনুগ্রহ।

এই অধমের প্রতি আল-াহ তায়ালার যে অসামান্য অনুগ্রহ; যা যোগ্যতা ও প্রার্থনা ছাড়াই দান করেছেন, তন্মধ্যে একটি ঈর্ষণীয় বিষয় হলো- এই অধমের জন্ম হয়েছে ৯ রবিউল আউয়াল ১৩৭৭হিজরী সোমবার ভোরে। অর্থাৎ আমার জন্মের দিকদিয়েও কিভাবে যেন প্রিয়তম নবী সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর জন্ম তারিখ এবং দিন ও ক্ষণের সাথে মিলে গিয়েছিল। অন্ড়ত পৃথিবীতে আগমনের ক্ষেত্রে প্রিয়তম নবীর এই অনুকরণটুকু সৌভাগ্যের কম কোথায়?

এই অধমের জন্ম ফুলাতে। মাওলানা মানাযির আহসান গিলানী আমাদের এই ফুলাতকে ভারতের 'আল্ বাদু' - বেদুঈননিবাস বলেছেন। ফুলাত এমন একটি জনবসতি যার একটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য হলো– ৮৬২ হিজরীতে এখানে একটি বাবলা গাছের ছায়ায় দু'রাকাত নফল নামাজ পড়ে স্বীয় শিষ্যদের পাঠদানের মাধ্যমে পাঠশালার ভিত্তি রেখেছিলেন আরিফে রব্বানী হযরত কাজী ইউসুফ নাসেহী। তিনি ছিলেন বাদশাহ সেকান্দর লোধীর উস্ড়াদ ও মুরুব্বী এবং শাহ বাহলুল লোধীর সম্মানিত পীর।

হিজরী ৮৬২ থেকে সেই পাঠশালা নানারূপে নানানামে আজও চালু আছে। আমার পীর ও মুর্শিদ হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)-এর নির্দেশে আজ সেই প্রাচীন পাঠশালাটিই জামেয়া ইমাম ওয়ালীউল-াহ নামে পরিচিত।

এ পাঠশালা হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত শাহ ওয়ালীউল-াহ মোহাদ্দেসে দেহলভী (রহ.)-এর আত্মিক পাঠশালা এবং গুর“গৃহ। এর আরও বড় বৈশিষ্ট্য হলো– এই পাঠশালার ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় যারা যুগে যুগে স্নাত হয়েছেন, উজ্জ্বল করেছেন আমাদের ভারতবর্ষের উপমাময় ঐতিহ্যকে তাদের মধ্যে রয়েছেন, হযরত মোজাদ্দে আলফেসানী শায়েখ আহমদ সেরহিন্দী (রহ.), তার পীর ও মুর্শিদ হযরত খাজা বাকীবিল-াহ (রহ.), ইতিহাসখ্যাত মোহাদ্দেস শায়েখ আলী মোত্তাকী বুরহানপুরী (রহ.)- যিনি কাজী ইউসুফ নাসেহীর প্রপৌত্র, শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দেসে দেহলভী, শাহ ওয়ালীউল-াহ মোহাদ্দেসে দেহলভীর সম্মানিত পিতা শাহ আব্দুর রহীম দেহলভী এবং তাঁর দাদা হযরত শায়েখ অজিহুদ্দীন শহীদ (রহ.)। যিনি তার পীর ও মুর্শিদ শাহ আবুল ফাতাহ (রহ.)-এর খলীফা ও জানশীন হযরত নেজাম নারনোলভী (রহ.)-এর ইঙ্গিতে র“হাতক থেকে হিজরত করে ফুলাত এসে বসবাস শুর“ করেছিলেন। এই জনবসতি আমির“ল মোমিনীন হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর বিপ-বের সূচনাকেন্দ্র হওয়ার গৌরবও লাভ করেছে। মূলত হযরত কাজী ইউসুফ নাসেহী (রহ.)-এর বংশধর মাশায়েখে কেরামের নিবাস এবং হযরত শাহ ওয়ালীউল-াহ মোহাদ্দেসে দেহলভী (রহ.)-এর মাতুলালয় হওয়ার গৌরবে উজ্জ্বল এই অঞ্চলকে অনেকটা কলংকিত করার জন্যেই এর সাথে যুক্ত হয়েছে এই অধম বান্দার সম্পর্ক।

আমার পিতা জনাব হাজী মুহাম্মদ আমিন সাহেব (রহ.)। তিনি তাঁর ছেলেবেলায় দাদাজানের সাথে গিয়ে হযরত শায়েখ বাহাউদ্দীন চরিভী (রহ.)-এর হাতে মুরীদ হোন। তিনি ছিলেন হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর সিলসিলার একজন অন্যতম বুযুর্গ। পরবর্তীতে হযরত শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান (রহ.)-এর হাতে বাইয়াত হন। হযরত

থানভী (রহ.)-এর সাথে তাঁর চিন্ড়ার মিল ছিল গভীর। তাছাড়া হযরত মাওলানা আসাদুল-াহ (রহ.), হযরত শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) এবং হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব (রহ.)-এর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তিনি ছিলেন এই অঞ্চলের বিখ্যাত জমিদারদের একজন। খুবই সাদামাটা জীবনযাপন করতেন । কিন্তু চিন্ড়া চেতনা ছিল খুবই উঁচু । কৃষিকর্মও করতেন খুব মানসম্মত। পশ্চিম ইউপিতে তিনিই সর্বপ্রথম ইংল্যান্ড থেকে দুটি ট্রাক্টর এনেছিলেন। এই ট্রাক্টর ব্যবহারের নির্দেশনার জন্য দু'জন ইংরেজ আমাদের ঘরে দুই মাস থেকেছিল। এলাকার মানুষ তাকে মিয়াজী বলে ডাকতো। এ অঞ্চলের অমুসলিমরা তাঁর আন্ড়রিকতা ও দান-দক্ষিণার কারণে নানা উপাধিতে ডাকতো। অজিফা পাঠে এবং আমলের র“টিনে ছিলেন কঠিন নিয়মতান্ত্রিক। জীবনের শেষ ষাট বছরে সম্ভবত কখনও তাহাজ্জুদ এবং অজিফা ছুটেনি। সুখ-দুঃখে মানুষের কাছে থাকতেন। তাঁর সরলতা, ক্ষমা এবং হৃদ্যতার অগণিত কাহিনী সাধারণ ও বিশেষ লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল। লেনদেনের স্বচ্ছতার কারণে অনেক বড় মানুষ পর্যন্ড় তাঁকে অসামান্য সম্মান করতো। আমাদের দাদাজি জহুর“ল-াহ (রহ.) ছিলেন হযরত গঙ্গুহী (রহ.)-এর মুসতারশিদগণের মধ্যে অনেক পরকালমুখী ও অত্যন্ড় সাদা মনের একজন সুফী মানুষ।

এই অধমের মাতা মুহতারামা জুবাইদা খাতুন। নাসিরপুর মুজাফফরনগরের এক সম্মানিত বংশের কন্যা। তিনি আমার বাবার তৃতীয় স্ত্রী। আমার বাবা প্রথম বিয়ে করেছিলেন তাঁর এক বিধবা মামীকে। তিনি বয়সেও আমার বাবার চেয়ে বড় ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর আমার বাবা ফুলাতেই দ্বিতীয় বিয়ে করেন। অল্প দিনের ব্যবধানে তিনিও মারা যান। তৃতীয়বারে আমার মাকে বিয়ে করেন। আমার মা বয়সে আমার বাবার চাইতে অনেক ছোট ছিলেন। তবে চরিত্রে ছিলেন এক অসামান্য বিদুষী নারী। অসহায় দুঃখী মানুষের প্রতি তাঁর টান ছিল স্বভাবজাত। জীবনভর তিনি ছিলেন এই হাদীসের জীবন্ড় নমুনা–

صل من قطعك واعف عمن ظلمك وات من حرمك واحسن من اساء

mv‡ne `v. ev.-Gi AvZ¥Rxebxg~jK mv¶vrKvi

اليك

অর্থ : 'যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক তৈরি কর। যে তোমার প্রতি অবিচার করে তাকে তুমি ক্ষমা করে দাও। যে তোমাকে বঞ্চিত করে তাকে দান করো। আর যে তোমার প্রতি অশোভ আচরণ করে তুমি তার প্রতি উত্তম আচরণ করো।'

আমার মা প্রায়ই আদর করে আমার ভাই বোনদের কাছেও আমার প্রশংসা করতেন। বলতেন, আমার কালিম সেই ছোটবেলায়ও আমাকে কখনও পেরেশান করেনি। এটাও এই অধমের প্রতি আল-াহ তায়ালার এক মহান নেয়ামত। আমার বড় দুই ভাই তিন বোন। আমার ছোট এক ভাই দুই বোন।

যে ঐতিহাসিক মাদরাসার উপর ফুলাতের ভিত্তি, হযরত গঙ্গুহী (রহ.) তাঁর এক মুরীদ মাওলানা ফয়েজ আহমদ ফুলাতীর নামে যার নাম রেখেছিলেন ফয়জুল ইসলাম এবং এখন যেটা জামেয়া ইমাম ওয়ালীউল-াহ সেখানেই আমি প্রাথমিক পড়াশোনা করি।

এই প্রতিষ্ঠানে ১৯২৯ সালে গান্ধীজী এসেছিলেন। পরিদর্শন বইয়ে তিনি এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাণী লিখেছিলেন। আমার বড় ভাই যখন আমাকে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করতে নিয়ে যান, তখন আমার বয়স চার বছর পূর্ণ হয়নি। আইন ছিল পাঁচ বছরের কমে কোনো শিশু প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে না। আমার বড় ভাই তখন আমার বয়স এক বছর বাড়িয়ে ভর্তি করে দেন। এক মাসে কায়দা এবং আমপারা পড়ে শেষ করি। তারপর কুরআন মাজীদ পড়ার আগ্রহ জাগে। চার দিনে পুরো কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ে শেষ করি। পঞ্চম দিন আমার উস্ড়াদকে কুরআন শরীফের বিভিন্ন জায়গা থেকে শুনাই। খুশিতে আমার পরিবার বাতাসা বিতরণ করে। পঞ্চম শ্রেণীতে গিয়ে কুরআন শরীফ হেফজ শুর" করি। সে বছর সাতপারা মুখস্থ করেছিলাম। খাতুলিতে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হই। প্যাক্ট ইন্টার কলেজ থেকে বিজ্ঞানে দ্বাদশ শ্রেণী পাস করি। আমি যখন ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র, তখন ফুলাতে একটি আরবদের জামাত এসেছিল।

সেই জামাতের আমীর ছিলেন আফ্রিকাপ্রবাসী একজন গুজরাটি। আমি তাঁর অনুমতিতে সেই জামাতে তিনদিন কাটাই। তারপর তাবলীগ জামাতের সাথে আমার স্বভাবের মিলের কারণেই জীবনের জন্য মিশে যাই।

হযরত মাওলানা আলাউদ্দিন নামে ফুলাতে এক বুযুর্গ বাস করতেন তিনি ছিলেন আমার মায়ের পীর ও মুরশিদ এবং আমার বাবার ধর্মীয় পরামর্শক ও একান্ড় বন্ধু । তিনি আমার এবং আমাদের সব ভাই-বোনদের নাম রাখেন। হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) তাঁর তাবলীগী মেহনত শুর" করার সূচনাকালে তিনবার এই বুযুর্গের সাথে ফুলাতে এসে পরামর্শ করেছিলেন। হযরত থানভী (রহ.)-এর কাছেও তাঁর অনেক গুর"ত্ব ছিল। আমাদের অঞ্চলের লোকেরা মাওলানা আলাউদ্দিন (রহ.) কে বড় মওলভী বলে ডাকতো। মূলত তাঁর প্রতি সম্মান দেখাতে গিয়েই তাবলীগ জামাতের প্রথম নিয়ম ছিল এমন– ফুলাতে এসে তাবলীগের কোনো তাশকীল হতো না। পরে এ বিষয়ে মানুষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। এখানকার অধিবাসীরা মনে করতে থাকে– ফুলাতের লোকদের জামাতে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। ফলে এখানে তাবলীগের কাজ ছিল প্রায় শূন্যের কোঠায়। এ কারণে আমার মনে চরম কষ্ট ছিল। একবার আমি ছেলেদের নিয়ে একটি জামাত শুর" করলাম। কাজ শুর" করলাম। মাঝে মধ্যে এক দু'জন মুর"ব্বি আমাদের প্রতি মমতার কারণে জামাতে এসে শরীক হতেন। গাশতে সহায়তা করতেন। জামাতের সাথে সম্পৃক্ততার কারণে স্কুলে আমার মাঝে মধ্যে অনিয়ম হতে লাগলো। প্রথম দিকে স্কুলের শিক্ষকগণ আমার প্রতি কিছুটা মন্দ ধারণাও করে বসেন। তারপর যখন প্রতিটি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে লাগলাম তখন আমার প্রতি আমার শিক্ষকদের আস্থা গড়ে ওঠে। ইন্টার মিডিয়েট করার পর মিরাঠ কলেজ থেকে বিএসসি করি। তারপর এমবিবিএস-এর ভর্তি পরীক্ষা পিএমটিতে অংশগ্রহণ করি। আলহামদুলিল-াহ! পুরো রাষ্ট্রে আমি ৫৭তম স্থান দখল করি। বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের পক্ষ থেকে আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লেখা হয়। তাদের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার আমন্ত্রণ

mv‡ne `v. ev.-Gi AvZ¥Rxebxg~jK mv¶vrKvi

জানায়। কিন্তু তখন দয়াময় আল-াহর এ বান্দার প্রতি কর“ণা বর্ষণের সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমার প্রতি তখন আল-াহ তায়ালার দয়া বর্ষণ শুর“ হয়েছে। আল-াহ তায়ালার প্রিয় বান্দাদের দরবারে বার বার উপস্থিতি, নেক বান্দাদের সাথে পারিবারিক সম্পর্ক, বিশেষ করে মা-বাবার অসামান্য সৎকর্মের উসিলায় আল-াহ তায়ালা আমাকে শায়খুল আরব ওয়াল আজম হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)-এর কদমের কাছে পৌঁছে দেন। মূলত তাঁর সম্পর্কের বরকতেই আমি নদওয়ার বিশেষ জামাতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাই। এমবিবিএস করার ইচ্ছা পরিত্যাগ করি। প্রথমে বিষয়টি আমি আমার পরিবারকে জানাইনি। তাছাড়া আমি যে পিএমটিতে অংশগ্রহণ করেছি, সেটাও কাউকে বলিনি। পরে যখন আমার ভাইয়েরা জানতে পেরেছে তখন খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছে। তারা বলেছে, তুমি আমাদেরকে এতটাই দুনিয়াদার ভেবেছো! তুমি দুনিয়াকে ছেড়ে দীনকে বেছে নিয়েছো- এটা আমাদের জন্যেও অনেক বড় সুসংবাদ। আমার হযরত নদভী (রহ.), হযরত মাওলানা আরেফ সাম্বালী (রহ.) ও হযরত মাওলানা শাহবাজ ইসলাহীকে এই অধমের প্রতি বিশেষ নজর রাখতে বলেন। তাঁরা নদওয়াতুল উলামার মসজিদে এই অধমকে বিশেষভাবে সময় দিতেন। এই অধম নদওয়ায় থেকে কেবল নদওয়ার র“টিই খেয়েছে। মুজাফফরনগরের এক গ্রাম্য ছেলের আর করারই বা কী ছিল! সে যাই হোক, সেখানে এক পরিবেশ ছিল। হযরত মাওলানা নদভী (রহ.) হরিয়ানায় মুসলমানদের ধর্মত্যাগী হওয়ার বেদনাদায়ক ঘটনায় ব্যথিত হয়ে আমাকে সেখানে কাজ করার জন্যে পাঠিয়ে দেন। ফলে নদওয়ায় থেকে পড়াশোনা শেষ করার সুযোগ আমার আর হয়নি। আমাকে বঞ্চিত অবস্থায়ই ফিরে আসতে হয়। এদিকে মানুষ আমাকে মাওলানা বলতে শুর“ করে। প্রথম দিকে বাধা দিতাম। পরে অনুভূতিহীনের মতো অভ্যস্ড় হয়ে পড়েছি।

প্রশ্ন : একবার হযরত মাওলানা (রহ.) আপনাকে 'মওলভী' বলেছিলেন, এমন কি যেন একটা তা আছে! তা জানতে পারি?

উত্তর : আমি তখন ফুলাতে। মহল-ার লোকজন বিশেষ করে আমাদের কৃষিকর্মের যেসব নিয়মিত শ্রমিক ছিল তারা আমাকে এক সময় ভাই সাহেব বলে ডাকতো। নদওয়ায় ভর্তি হওয়ার আগে আমি একবার খানকা শাহ আলামূল-াহয় হযরত (রহ.)-এর খেদমতে কিছুদিন থাকি। সেই সময়কার কথা। মসজিদ থেকে বাংলোয় এসেছি। হযরত মাওলানা (রহ.) সেখানে আগেই উপবিষ্ট ছিলেন। আমাকে দেখেই বললেন, আসুন মওলভী কালিম সিদ্দিকী সাহেব। তারপর যখন আমি ফুলাত ফিরে এলাম তখন যার সাথেই দেখা হতো সেই আমাকে মাওলানা সাহেব, মওলবী সাহেব বলতে শুর“ করে। প্রথম দিকে খুবই লজ্জাবোধ করতাম। নিষেধ করতাম। কিন্তু কত দিন এভাবে পারা যায়? অবশেষে আমাকে হার মানতে হয়। আমার হযরতের মুবারক মুখ থেকে বেরিয়ে আসা শব্দটি কিভাবে যেনো সকলের মুখে চালু হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন : আপনার বিয়ের ঘটনাটিও উলে-খযোগ্য। তো কিভাবে আপনার বিয়ে হলো, বলবেন?

উত্তর : ১৯৮০ সালের কথা। হযরত (রহ.)-এর কৃপায় রাজকীয় নিমন্ত্রণে হযরতের সাথে হারামাইন শরীফাইন-এর জিয়ারতের উদ্দেশে হজ্বে যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করি। মাত্র তের দিনের মধ্যে পুনরায় ফিরে আসি। তখন সৌদী আরবের বাদশাহ ছিলেন শাহ খালেদ। তিনি আমাদেরকে অনেক সম্মান করেছিলেন। ফিরে এসে আমি তাঁকে একটি কৃতজ্ঞতা পত্র লিখি। তাতে খুব দ্র“ত ফিরে আসার কারণে আমার আক্ষেপের কথাও বলি। আমার এই চিঠি পেয়ে তিনি আমাকে মদীনা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির ব্যবস্থা করে দেন। বিভিন্ন মাধ্যমে জানতে পারি, সেখানকার শাহী খান্দানের কেউ নাকি বিয়ের প্রতিও আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। এই সময়েরই ঘটনা। মেওয়াতের একটি জামাত। তাদের আমীর অসুস্থ হয়ে পড়ায় তারা খুব পেরেশান ছিল। আমি তখন তাদের চিল-া পূরণ করার জন্যে তাদেরকে নিয়ে ঝানঝানাই যাই। সেখানে যাওয়ার পর আমার বিয়ের ব্যবস্থা হয়। এক ঘনিষ্ঠজনের মাধ্যমে একটি

দীনদার পরিবারের নানা সংকটের কথা জানতে পারি। এই অধম একটি দীনদার পরিবারের যদি কোনো উপকারে আসে– সেই মানসে বিয়ের ইচ্ছা করি। আলহামদুলিল-াহ! অত্যন্ড় সাদাসিধেভাবে বিয়ে সম্পাদিত হয়। যখনই কেবল আল-াহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে কোনো কাজ করতে ইচ্ছা করেছি, দেখেছি আল-াহ তায়ালা আমাকে তাঁর নেয়ামতে সিক্ত করেছেন। এখানেও আল-াহ তায়ালা আমাকে একজন উপমাময় হাফেজা, কারিয়া, পবিত্র স্বভাবের অধিকারী জীবন সঙ্গিনী দান করেছেন। আমার ঘরের বরং খান্দানের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সে কুরআনের সুবাস পৌঁছে দিয়েছে। খান্দানের শিশুদের মধ্যে কুরআনে কারীমের প্রতি আকুল আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে তারই অসামান্য সহযোগিতায় এই ঋণ সত্যিই অনুপম। আলহামদুলিল-াহ!

প্রশ্ন : আপনি এক দুইবার শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহ.)-এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন, তাঁর খেদমতে উপস্থিত হওয়ার কথাও বলেছেন। বিষয়টি আরেকটু বিস্ড়ারিত বলবেন কি?

উত্তার : ছেলেবেলা থেকেই পত্র লেখাটা ছিল আমার পরম আগ্রহের বিষয়। বরং যদি এভাবে বলি তাহলে ভালো হয়– আল-াহ তায়ালা আমাকে এই পৃথিবীর সবকিছুর সাথে যুক্ত করে আবার সবকিছু থেকে আলাদা করে এনে তাঁর প্রিয় বান্দাদের পায়ের কাছে ছেড়ে দিয়েছেন। আমার জীবনের শুর"র দিকে কবিতা উৎসবের প্রতি অসামান্য ঝোঁক ছিল। বিশেষ করে কবিতা আবৃত্তি ছিল আমার একান্ড় সখের বিষয়। আমার কণ্ঠস্বর ছিল চমৎকার। পঞ্চাশ জনেরও বেশি কবির কবিতা তাদেরই সুরে তাদেরই ভঙ্গিতে আবৃত্তি করে শোনাতে পারতাম। ঘরে বিশেষ কোনো অতিথির আগমন হলে আমাকে রাতের বেলা ঘুম থেকে ডেকে তোলা হতো। বলা হতো, কবিতার জলসা হবে। আমি অনায়াসে আনওয়ার জালালপুরী, মহেন্দ্র সিং বেদী প্রমুখের স্টাইলে সেই কবিতা-জলসায় উপস্থাপন করতাম। বিভিন্ন কবির কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতাম। এক সময় আমি নিজেও কবিতা লিখতে শুর" করি। গল্প লেখায় হাত দিই। 'খাতুনে মাশরিক' এবং 'বিসওবিঁসদী'তে আমার

অনেক গল্প প্রকাশিত হয়। বেশ কিছু নাটকও লিখেছি। অল ইন্ডিয়া রেডিও থেকে আমার কোনো কোনো নাটক প্রচারিতও হয়েছে। গানও গেয়েছি। সামান্য চেষ্টায় কিছু মিউজিকও শিখেছিলাম। অল্প কসরতেই ছবি আঁকা শিখেছিলাম। কয়েকটি প্রতিযোগিতায় প্রাদেশিক পুরস্কারও জিতেছি। আল-ামা শামস নাভীদ উসমানীর 'কিয়া হাম মুসলমান হ্যাঁ?' গ্রন্থটি আমাকে খুব প্রভাবিত করেছিল। এই বইটি পড়ার পর ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবলম্বন করে গল্প লিখতে শুর" করি। আমার সেসব গল্প বিশেষ করে রামপুর থেকে প্রকাশিত 'নূর' 'বাতুল' এবং 'জিকরা' প্রভৃতি ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। সে সময় নূর পত্রিকায় কলাম লেখক হিসেবে আমার একটি ইন্টারভিউও ছাপা হয়েছিল।

বুযুর্গানে দীনের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রতিও আমার আগ্রহ ছিল। সেই আগ্রহ থেকেই হযরহত শায়খুল হাদীস (রহ.) কে চিঠি লিখি। চিঠিতে আমার পরিচয় দিতে গিয়ে আমার বয়স এখন সতের ইত্যাদি... উলে-খ করি। আমার চিঠি যখন সাহারানপুর পৌঁছায়, হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) তখন মদীনার উদ্দেশে রওনা হচ্ছিলেন। তিনি তাঁর কোনো এক খাদেমকে চিঠিটির প্রাপ্তিসংবাদ জানিয়ে আমাকে উত্তর লেখার দায়িত্ব দিয়ে যান। সেই খাদেম তখন আমার বয়স বিবেচনা করে জবাবী চিঠিতে পছন্দসই স্ত্রী প্রাপ্তির একটি তাবিজও লিখে পাঠান। এই বয়সে ভাইবোনদের মধ্যে চিঠিপত্র সংরক্ষিত থাকা মোটেও সহজ কথা নয়। আমার ছোট বোন জয়নব চিঠি পেয়েই খুলে ফেলে। চিঠি পড়ে সে আমাকে জড়িয়ে ধরে। বলতে থাকে, ভাই মিয়া! আপনি কাকে বিয়ে করতে চান? তাবিজের কী দরকার ছিল? আমাকে বলুন, আমি আম্মুকে বলে দিই। আমি তো ভয়াবহ লজ্জায় পড়ে গেলাম। এই রকমের বিষয়ে নিজেকে নিষ্পাপ প্রমাণ করাও সহজ কথা নয়। আমার মন ভেঙ্গে যায়। দীর্ঘদিন পর্যন্ড় পুনরায় চিঠি লেখার আর হিম্মত হয়নি।

তারপর যখন আমি মিরাঠ কলেজে গ্র্যাজুয়েশন করছি, হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) মদীনা মুনাওয়ারা থেকে সাহারানপুর আগমন করেন। আমার বড় দুলাভাই স্বভাবে যেমন কোমল তেমনি অসামান্য বিনয়ী মানুষ। তিনি

আমাকে বললেন, কালিম! হযরত শায়েখ সাহারানপুর তাশরিফ এনেছেন, চলো সাক্ষাৎ করে আসি। আমি বললাম, খুব ভালো। আমি তখন নতুন একটি বেলবটম প্যান্ট এবং একটি আধুনিক ফ্যাশনের শার্ট বানিয়েছি। নতুন কাপড় পড়লাম। ভাই সাহেবের সাথে আসর নামাযের পূর্বেই সাহারানপুর গিয়ে হাজির হলাম। মাজাহেরে উলুম-এর পুরনো মসজিদে আসর নামায আদায় করলাম। নামাযের সাথে সাথেই মজলিস হলো। সকলেই নিজ নিজ আসন দখল করে নিলো। আমরা বাইরে জুতা রাখার স্থানে কোনো রকম দাঁড়াবার জায়গা পেলাম। কোনো একটি কিতাব পাঠ করা হচ্ছিল। কিতাবপাঠ শেষ হওয়ার পর বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি ঘোষণা করলো− যারা চলে যাবেন তারা মোসাফাহা কর৺ন। আর যারা এসেছেন তারা সকালে মোসাফাহা করবেন। আগেই উলে-খ করেছি− আমার দুলাভাই অসামান্য বিনয়ী মানুষ। তিনি আমাকে বললেন, আমার পাপী মানুষ এত বড় বুযুর্গের সাথে কিভাবে হাত মিলাই। আমি এখান থেকেই জিয়ারত করে নিচ্ছি। তুমি গিয়ে হাত মিলিয়ে এসো। আমি বললাম, আমি বিদায়ীদের সাথে মোসাফাহা করবো এবং আগতদের সাথেও মোসাফাহা করবো। লাইনে দাঁড়িয়ে গেলাম। যখন আমার পালা এলো তখন হযরত আমার হাত চেপে ধরলেন। পরম মমতায় হাত চেপে রেখেই সামান্য হেসে ভরাটকণ্ঠে বললেন− এসো প্রিয়, আজ তোমার সাথে হাত মিলানোর জন্যেই বসেছি। তুমি আগতদের সাথেও হাত মিলাবে, বিদায়ীদের সাথেও হাত মিলাবে। আজ প্রাণভরে মোসাফাহা করে নাও। তিনি এ কথা বলছিলেন আর মিটিমিটি হাসছিলেন। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ড় আমার হাত চেপে ধরে রাখেন। প্রায় পাঁচ মিনিট পর্যন্ড় মোসাফাহার লাইন দাঁড়িয়ে থাকে। মাওলানা নাসির সাহেব, যার সাথে পরে পরিচয় হয়েছে, আমার হাত ছাড়াবার জন্যে হযরতের কাছে সুপারিশ করতে থাকেন। তার অনুরোধ তখন আমার কাছে মোটেও ভালো লাগেনি। আমি ভাবছিলাম, মোসাফাহা যত দীর্ঘ হয় ততই আমার জন্যে আনন্দদায়ক।

প্রশ্ন : হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) যে বললেন, তুমি আগতদের

সাথেও হাত মিলাবে এবং বিদায়ীদের সাথেও হাত মিলাবে, তো তিনি কি আপনার কথা শোনেছিলেন?

উত্তর : তখন তো আমার কাছে এমনই মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন চিন্ড়া করি এতটা দূর থেকে আমার কথা শোনার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কাশফ বা অন্য কোনো মাধ্যমে হযরত হয়তো জেনে ফেলেছিলেন।

প্রশ্ন : তারপর কী হলো?

উত্তর : কিছুক্ষণ পর হযরত আমার হাত ছেড়ে দিলেন। সেই মোসাফাহার স্বাদ এখনও আমি অনুভব করি। এশার নামাযের কিছুক্ষণ পর ভাই সাহেব বললেন− এখন খাতুলির ট্রেন আছে। হযরতের সাথে সাক্ষাৎ তো হলোই, মোসাফাহাও হলো। চলো, এখনই চলে যাই। সকালের ট্রেনে প্রচুর ভিড় হবে। আমরা চলে আসি। তারপর আমি এক দুটি চিঠি লিখেছি। উত্তরও এসেছে। এই সময়ে মিরাঠের একজন কারী সাহেব যিনি ফুলাতে থাকতেন, তার ক'জন মুক্তাদি এবং মিরাঠের কিছু সম্মানিত ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে সাহারানপুর যান। ফুলাতের সাথে হযরতের ছিল মনের সম্পর্ক। ফুলাতের কেউ গেলে সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে ডাকতেন। তাঁদেরকেও ডাকলেন। হযরত শায়েখ (রহ.) তাদেরকে বললেন, ফুলাতে আমাদের এক বন্ধু থাকেন। তিনি জিজ্ঞেস- হযরত! আমি তো দীর্ঘদিন হলো মিরাঠে আছি। তো ফুলাতে আপনার বন্ধু কে? হযরত বললেন, কালিম। তারপর তিনি তাঁর সঙ্গীদেরকে নিয়ে মিরাঠ ফিরে যান। পরে আমার বড় ভাই এডভোকেট মুহাম্মদ আলীম সিদ্দিকীকে যিনি তখন ওকালতি করতেন, জিজ্ঞেস করেন, ফুলাতে কালিম সাহেব কে? হযরত তার কথা আলোচনা করছিলেন। বড়ভাই বললেন, ফুলাতে কালিম তো আমার ছোট ভাই। মিরাঠে পড়াশোনা করতো। কারী সাহেব বললেন, না, সে কোনো ছেলে মানুষ নয়। কোনো বুযুর্গ ব্যক্তি হবেন। কারণ, হযরত বলছিলেন ফুলাতে আমাদের এক বন্ধু থাকেন।

হযরত শায়েখের সেই মমতাপূর্ণ মোসাফাহাকে আমি আমার জীবনের বাঁক পরিবর্তনের বড় একটি ভিত্তি মনে করি। আমাদের ফুলাতে হাফেজ

আবদুল লতিফ নামে এক ব্যক্তি কাসেমপুরী মাদরাসায় পড়াতেন। তিনি ছেলেবেলাতেই হযরতের কাছে মুরীদ হয়েছিলন। সেকালে হযরতের দরবারে ভিড় ছিলো না। একবার তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় হযরতের কাছে চিঠি লিখলেন। তার চিঠির উত্তরে হযরত তাকে লিখেছিলেন- ফুলাতে আমাদের এক বন্ধু থাকেন। তার সাথে গিয়ে মাঝেমধ্যে সাক্ষাৎ করবে। উত্তরে হাফেজ সাহেব লিখেছিলেন, ফুলাতে তো কালিম নামে একজন ছেলে থাকে। সে কলেজের ছাত্র। তার উত্তরে হযরত এই অধমের সাথে সম্পর্ক রাখতে আদেশ দেন। ভেবে আমি এখনও বিস্মিত হই– সেকালে হুক্কা এবং বিড়ির গন্ধ আমি একেবারেই সহ্য করতে পারতাম না। বমি হয়ে যেতো। হাফেয সাহেব আমাকে চিঠিটি দেখিয়েছিলেন- হযরত লিখেছিলেন– সে হুক্কা এবং বিড়ির গন্ধ মোটেও সহ্য করতে পারে না। বিষয়টির প্রতি লক্ষ রাখবে। এদিকে হাফেজ সাহেব ছিলেন হুক্কা এবং বিড়ির পাগল।

পরে ধীরে ধীরে শায়খের সাথে বন্ধন গভীর হতে থাকে। তারপর মসীহুল উম্মাহ হযরত মাওলানা মসীহুল-াহ খান (রহ.) মাজাহেরু‍ল উলুম মাদরাসার নাজেম মাওলানা আসআদুল-াহ সাহেব (রহ.)- এর দরবারেও গিয়েছি। তাদের সাথে একাধিক পত্রালাপ হয়েছে। হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.)- এর দরবারে আসা যাওয়া হতো। প্রথম দিকে হযরত আমাকে মানুষের সামনে পরিচয় করিয়ে দিতেন। আমি স্বভাবগতভাবেই খুব দুর্বল চিত্তের মানুষ। কিছুটা হীনমন্যতারও শিকার। হযরতের এ জাতীয় সম্মানপ্রদর্শনমূলক মমতা আমি অনেকটা বোঝা অনুভব করতে থাকি। একবার হযরতের কাছে নিবেদন করলাম– মন চায়, বার বার আসি। কিন্তু মানুষ আঙুল তুলে তাকায়। লজ্জাবোধ করি। যদি লাইনে দাঁড়িয়ে মোসাফাহা ও সাক্ষাতের অনুমতি হয় তাহলে বার বার উপস্থিত হওয়ার সাহস পাই। হযরত আমার নিবেদন কবুল করলেন। কিন্তু একবার বললেন, ভালোবাসা কাজে লাগে এই পরিচয়ও কাজে লাগবে।

প্রশ্ন : হযরত মাওলানার সাথে বাইয়াতের সম্পর্ক কিভাবে হলো?

উত্তর : এই অধম হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)- এর বইপত্র নিয়মিতই পাঠ করতো। আমাদের ছোট ভগ্নিপতি সাইয়েদ সাঈদ আক্তার সাহেব একবার এক ব্যক্তির পারিবারিক লাইব্রেরী কিনে নেন। সেখানে হযরত মাওলানার অনেক বইপুস্ড়ক পেয়ে যাই। তারীখে দাওয়াত ওয়া আজীমত, সীরাতে সাইয়েদ আহমদ শহীদ, তাযকেরা শাহ ফজলে রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী প্রভৃতি। কিন্তু বুযুর্গ হিসেবে আমাদের অঞ্চলে তাঁর কোনো পরিচয় ছিল না। ফুলাতে হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর ঘটনাবলী তো ঘরের বৃদ্ধা মহিলারা বরকতের জন্যে এমনিতেও বাচ্চাদেরকে শুনিয়ে থাকে। একদিন একটি ঘটনা পড়ে আমার মন একেবারে ভেঙ্গে যায়। আমি তখন হযরতের ‘নুকুশে ইকবাল’ গ্রন্থটি পাঠ করছিলাম।

শিরোনাম ছিল ‘ইকবাল দারেদৌলতপর’। এই শিরোনামের অধীনে ইকবালের ভালোবাসা এবং গভীর প্রেমস্নাত মদীনা জিয়ারতের কাহিনী বিধৃত হয়েছে। হযরত (রহ.)-এর হৃদয়ের ভাষায় অংকিত সেই কাহিনী পড়ে এই অধমের মনের অবস্থা ছিলো অন্যরকম। মনে হচ্ছিল যেনো, সেই মদীনার কাফেলায় এই অধমও উপস্থিত। সেই সময়টাতে হযরত রাসূলে কারীম সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর জিয়ারতের আবেগও ছিল মর্মস্পর্শী। তাঁর জিয়ারত লাভের প্রত্যাশায় কত রকমের আমল করেছি। ক্রমাগত আমার তৃষ্ণা বেড়েছে। এই অধমের প্রতি আল-াহ তায়ালার মমতা জেগেছে। এত শত বুযুর্গের সাথে পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সত্ত্বেও আমার আল-াহ এই অধমকে হযরত মাওলানার কদমের সামনে এনে ঠেলে দিয়েছেন।

প্রশ্ন : বিষয়টা আসলেই আশ্চর্য হওয়ার মতো। এখানে এই এলাকায় এত বড় বড় ব্যক্তি। সকলের সাথেই আপনার পরিচয় এবং সম্পর্ক সবই ছিল। হযরত মাওলানার সাথে কোনো পরিচয় ছিল না। তো তাঁর কাছে পৌঁছালেন কিভাবে?

উত্তম : আসলে একটি স্বপ্নে আমাকে হযরত রাসূলে কারীম

সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর পক্ষ থেকে মাওলানা আলী মিয়ার মধু চেটে খাওয়ার নির্দেশ করা হয়েছিল। আমি হযরত মাওলানাকে মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী নামে জানতাম। স্বপ্নে দেখলাম মাওলানা আলী মিয়া। মাওলানা আলী মিয়া কে? সপ্তাহের পর সপ্তাহ আমি অস্থিরতায় ব্যাকুল। পরে নাঈম ভাই বললেন, হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীই মাওলানা আলী মিয়া। এ কথা জানার পর আমি তাঁর কাছে একটি চিঠি লিখি। হযরত স্নেহভরা ভাষায় তার জবাব পাঠান। জবাবী চিঠিতে এই কবিতাটিও ছিল–

بہر تسکین دل نے رکھ لی ہے غنیمت جان کر

جو بوقت ناز کچھ جنبش ترے ابرو میں تھی

অফুরান্ড় হৃদয়তৃপ্তি তুলে রেখেছে– ভেবে মহাধন
প্রণয়কালে ভুর"তে তোমার যে সামান্য আন্দোলন॥

চিঠির সাথে ভাড়ার জন্যে মনি অর্ডারও পাঠান। আলহামদুলিল-াহ! আমি হযরতের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশে খানকায় যেদিন গিয়ে ওঠি সেদিন ইন্দিরা গান্ধী হযরতের সাথে দেখা করার জন্যে খানকায় এসেছিলেন। বাংলোর বাইরে দেখি সারি সারি গাড়ি। পরিচয় বলার পর হযরত আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর আমরণ তিনি এই গ্রাম্য গোঁয়ার ছেলেটিকে তাঁর পায়ের সাথে জড়িয়েই রেখেছেন। আমি এখনও ভেবে বিস্মিত হই, কত বুযুর্গের সাথে আমার গভীর বিশ্বাসের সম্পর্ক। হযরত মুফতী মাহমুদ সাহেব (রহ.), হযরত মাওলানা আবরার"ল হক (রহ.), হযরত মাওলানা কারী সিদ্দিক আহমদ (রহ.), হযরত মাওলানা আব্দুল হালীম জৌনপুরী (রহ.), হযরত মাওলানা এনামূল হাসান কান্দালভী (রহ.), হযরত মাওলানা ইফতেখারুল হাসান কান্দালভী, হযরত মাওলানা মোকাররম হুসাইন সংসারপুরীসহ কত বুযুর্গের সাথে এই অধমের গভীর বিশ্বাস ও আন্ড়রিকতার সম্পর্ক! তাঁদের দরবারে আসা-যাওয়া আছে। আছে পত্র যোগাযোগ। কিন্তু এই অধমের প্রতি আল-াহ তায়ালার কত বড় কর"ণা, তাঁর ইচ্ছা ছিল তাঁর কিছু বঞ্চিত বান্দার হেদায়েতের উসিলা হিসেবে এই

পাপীকে কবুল করবেন। তাই তিনি আমাকে অন্য সকলের মধ্যে হযরত মাওলানার সাথে জুড়ে দেন। সত্যিই সেটা ছিল আমার জীবনে এক অসামান্য বরকতময় মুহূর্ত।

প্রশ্ন : হযরত মাওলানার হাতে আপনি কত সালে মুরীদ হন এবং কখন খেলাফত লাভ করেন? আচ্ছা আপনি কি হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.)-এর কাছেও মুরীদ হওয়ার দরখাস্ড় করেছিলেন? শুনেছি তিনি আপনাকে খেলাফতও দিয়েছিলেন। আসল ঘটনাটা কী?

উত্তর : আসলে বুযুর্গদের পক্ষ থেকে খেলাফত তিন ধরনের হয়ে থাকে। প্রথমত মুরীদের প্রতি পূর্ণ আস্থার ভিত্তিতে তাকে যোগ্য মনে করে আল-াহর বান্দাদের এসলাহ তরবিয়ত ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে খেলাফত দান। এটাই প্রকৃত খেলাফত। এটা একটা একান্ড় নিয়ামত। একমাত্র যোগ্য ব্যক্তিগণই এই নিয়ামত প্রাপ্ত হোন। দ্বিতীয় আরেকটি হলো– কোনো অঞ্চলের পশ্চাৎপদতার প্রতি লক্ষ করে সেই এলাকায় কাজ করার জন্যে দীনের সাথে সম্পর্ক আছে এমন কোনো ব্যক্তিও অনেক সময় শায়েখ খেলাফত দান করেন। তারপর দাওয়াত ও সংশোধনের কাজে নিয়োজিত করেন। তৃতীয় আরেকটি প্রকার হলো– আমাদের মতো লোকদেরকে খেলাফত দান। উদ্দেশ্য খেলাফতের নামে অন্ড়ত গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে। ভাববে, চলো, খলিফা যখন হয়েছি তখন পাপ থেকেও বেঁচে থাকি। তোমার জানা থাকার কথা, হযরত গঙ্গুহী (রহ.) একবার এক বাঙ্গালীকে হাদীসের সনদ দিয়েছিলেন। সনদটি লেখা ছিল আরবি ভাষায়। সেখানে সেই ব্যক্তির নামের সাথে বাঙ্গালী কথাটিও লেখা ছিল। আরবিতে বাঙ্গালী শব্দটি 'বান্জালি' লেখা হয়। তখন তার এক বন্ধু তাকে বললো, কিছুটা দুষ্টুমি করেই হযরত তোমাকে নামের সাথে গালি লিখে দিয়েছেন। সে হযরতের কাছে ফিরে আসে। হযরত বুঝিয়ে দেন আরবিতে বাঙ্গালী কথাটি এভাবে লেখা হয়। ছেলেটি চলে যাওয়ার পর হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেব (রহ.) হযরতকে বললেন, এমন একজন বেকুবকে আপনি হাদীসের সনদ দিলেন? হযরত এর উত্তরে

mv‡ne `v. ev.-Gi AvZ¥Rxebxg~jK mv¶vrKvi

বলেছিলেন– এই সনদের কারণে নিজেকে মাওলানা ভাববে। মসজিদে পড়ে থাকবে। নইলে চুরি ডাকাতি করে দীনদারদের বদনাম করবে। আমার হযরতও হয়তো এই উদ্দেশ্যেই আমাকে খেলাফত দিয়েছেন। ভেবেছেন, হয়তো এই সম্পর্কের সম্মানে নিজেকে রক্ষা করে চলবে।

প্রশ্ন : জানতে চাচ্ছিলাম, আপনি হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.)-এর কাছে বাইয়াতের দরখাস্ড় করেছিলেন?

উত্তর : আসলে বিষয়টা ছিল এই– স্বপ্নটি দেখার পর আমি অস্থির হয়ে পড়ি। জালালাবাদে হযরত মসীহুল-াহ খান (রহ.)-এর মজলিসে আমি বরাবরই যেতাম। প্রথমেই আমি তাঁর কাছে গিয়ে বাইয়াত হওয়ার দরখাস্ড় করি। তিনি বললেন, আপনি মাওলানা আলী মিয়ার কাছে বাইয়াত হন। জালালাবাদ থাকতেই আমার মনে হলো– হযরত শায়খুল হাদীস সাহেব তো মদীনা মুনাওয়ারা চলে যাচ্ছেন। সাহারানপুর গিয়ে হযরতের সাথে দেখা করে আসি। আমি যখন গিয়ে পৌঁছাই তখন সাক্ষাৎদান বন্ধ হয়ে গেছে। খাদেমগণ সাক্ষাৎ করতে দর্শনার্থীদেরকে নিষেধ করে দিয়েছে। আমি আমার ক্ষুদ্রতার কারণেই মূলত মনে করেছি, আমার দেখা হওয়া উচিত এবং অনেকটা অধিকার মনে করেই এক খাদেমকে বললাম– হযরতকে গিয়ে বলুন, ফুলাত থেকে কালিম এসেছে। হযরত আমাকে ঘরে ডেকে নিলেন। অত্যন্ড় মমতার সাথে নিজ হাতে কলা ছিলে আমাকে খেতে দিলেন। আমি আরজ করলাম, হযরত! আমাকে মুরীদ করুন। হযরত বললেন, প্রিয় কালিম! তুমি মুরীদ হবে মাওলানা আলী মিয়ার কাছেই। আর খেলাফত আমি দিচ্ছি। হযরত মাওলানা সানী হাসানী হযরতের কাছেই উপস্থিত ছিলেন। হযরত বললেন, দেখ সানী! কেউ যদি মুরীদ হতে চায় তাহলে যেন কালিমের হাতে মুরীদ হয়। আমি আগে থেকেই হীনমন্যতার শিকার ছিলাম। তখন মনে মনে ভাবলাম, মুরীদ হওয়ার জন্যে দরখাস্ড় করারও নিশ্চয় কোনো আদব আছে। বিশেষ কোনো নিয়ম আছে। আমি গ্রাম্য গোঁয়ার ছেলে বিধায় হযরত আমার সাথে রসিকতা করছেন। তারপর আমি হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করি।

বলতে থাকি, হযরত! আমি তো আদব জানি না। আপনাকে আমি কিভাবে বলবো, আমার তো জানা নেই। হযরত বললেন, প্রিয়, তোমাকে আমি ভালোর জন্যেই বলছি। মুরীদ তুমি আলী মিয়ার হাতেই হও। খেলাফত আমি দিচ্ছি।

প্রশ্ন : আপনি কি হযরতের কাছে আপনার স্বপ্নের কথা বলেছিলেন?

উত্তর : না, এটাই তো বিস্ময়ের বিষয়। উভয় বুযুর্গ কোথা থেকে একথা বললেন- মুরীদ তোমাকে আলী মিয়ার হাতেই হতে হবে।

প্রশ্ন : তারপর কী হলো?

উত্তার : এটা ১৯৭৭ সালের কথা। তারপর আমার মামা সাইয়েদ মুহাম্মদ আরেফ আমাকে হযরত মাওলানা আসআদুল-াহ সাহেবের খেদমতে নিয়ে যান। তাঁর সাথে অত্যন্ড় বরকতপূর্ণ এবং স্মরণীয় সাক্ষাৎ ঘটে। সেই সাক্ষাতের কিছু কথা এবং তার বরকত এই অধম জীবনভর উপলব্ধি করেছে এবং বিস্মিত হয়েছে।

প্রশ্ন : তারপর হযরত মাওলানার হাতে বাইয়াত কিভাবে হলেন?

উত্তার : আমি রায়বেরেলী খানকায় গেলাম। হযরত মাওলানা অত্যন্ড় স্নেহের সাথে আমাকে গ্রহণ করলেন। মাওলানা মুহাম্মদ সানীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন– এ হলো কালিম মিয়া। যার কথা আমরা আলোচনা করছিলাম। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সানী হযরতকে বললেন, এই কয়েকদিন আগে তাঁর সাথে হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.)-এর দরবারে সাক্ষাৎ হয়েছে। আমার দিকে ফিরে বললেন, আপনিই তো, নাকি? হযরত যে কাঁচা ঘরে ডেকে সাক্ষাৎ করলেন। আমি হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ালাম। আমি হযরতের কাছে মুরীদ হওয়ার দরখাস্ড় করলাম। খানকার মসজিদে হযরত আমাকে মুরীদ করে নিলেন। আসরের পর অনুষ্ঠিত মজলিসে আমার উদ্দেশে আশাব্যঞ্জক নানা কথা বললেন। বললেন, আল-াহ তায়ালার ভাণ্ডারে কোনো কিছুর অভাব নেই। বিশেষ

কারণে আল-াহ তায়ালা নবুওয়ত বন্ধ করে দিয়েছেন। কুতুব ওলী এবং আল-াহ তায়ালার মারেফাত ও মাহবুবিয়ত-এর পথ এখনও খোলা। প্রয়োজন শুধু বান্দার পক্ষ থেকে সাধনা। এর জন্যে নিজেকে পরিপূর্ণ কাঙালরূপে আল-াহর দরবারে উপস্থিত করা চাই। তারপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন–

وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا

অর্থ : 'আর তোমার প্রভুর দান সীমাবদ্ধ নয়'।

তারপর আমি নদওয়ায় ভর্তি হয়ে গেলাম। এমনিতেই গ্রাম্য এবং গোঁয়ার ছিলাম। কিতাবপত্র পড়ার আগ্রহ ছিল প্রচুর। দেওবন্দের মনীষীদের ইতিহাস এবং ওয়ালীউল-াহী খান্দানের বুযুর্গগণের জীবনী পড়তাম। স্মৃতিশক্তি ভালো ছিল। হযরত যখন কোনো কিছু বলতেন প্রতিটি কথার পিঠেই আমি কিছু না কিছু বলতাম। মানুষ মনে করতো, এ কেমন বেতমিজ ছেলে! কথার পিঠে কথা বলে। হযরতের মমতার কথা ভেবে এখনও কৃতজ্ঞতায় সংকুচিত হই– এই কারণে তিনি কখনও আমাকে কিছু বলতেন না। শাসাতেনও না। বরং উৎসাহ দিতেন। কখনও কখনও অজ্ঞতাবশত নিজেকে জ্ঞানী মনে করেও অনেক কথা হযরতের সামনে তুলে ধরতাম। এখন যখন সেসব কথা মনে পড়ে তখন লজ্জায় মুখ লুকাতে ইচ্ছা করে। তারপর হযরতের সান্নিধ্যে কিছুদিন থাকার পর হযরতকে কিছুটা উপলব্ধি করতে পারি। পরে আমার অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে– সপ্তাহের সপ্তাহ কেটে যেত, আগমন ও প্রস্থানের দুটি সালাম ছাড়া আর কোনো কথা বলারও হিম্মত হতো না।

প্রশ্ন : হযরত আপনাকে খেলাফত দিয়েছিলেন কখন?

উত্তর : বার বার সেই খেলাফতের কথা। বলতে ও শুনতেও লজ্জাবোধ হয়। আসলে আমি ২৭ মার্চ হযরতের হাতে মুরীদ হই। সে বছরই ১২ আগস্ট হযরত (রহ.) ফজর নামাযের পর মসজিদেই আমাকে কাছে ডাকেন। কাছে যাওয়ার পর বলেন, আল-াহর উপর ভরসা করে আমি তোমাকে একটি কথা বলছি। আল-াহর কোন বান্দা যদি আমাদের সিলসিলায় তোমার কাছে মুরীদ হতে চায় তাহলে তুমি তাকে মুরীদ করে

নিও। আমি তোমাকে খেলাফত দিচ্ছি। আমি অনেক আশা নিয়ে হযরতের কাছে মুরীদ হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম তাঁর সান্নিধ্যে থেকে হয়তো কিছুটা সৎ এবং নেক হতে পারবো। আমার জীবনে হয়তো সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর মতো নামায নসীব হবে। হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর সাথে সংশি-ষ্ট হওয়ার পর যেভাবে তাঁর মুরীদদের নসীব হয়েছিল। ভেবেছিলাম, আমি আমাকে চারিত্রিক সকল মন্দগুণ থেকে পবিত্র করতে পারবো। হযরতের এই বাণী শোনার পর মনে হলো যেন আমার উপর বজ্রপাত হলো। মনে হলো, একজন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ড় রোগী! চিকিৎসক অবশেষে নিরাশ হয়ে তাকে বলে দিয়েছে, তুমি এখন স্বাধীন। সবকিছু খেতে পারবে। তোমার আর কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন নাই। আমার মনে হলো, আমাকেও ঠিক তেমনিভাবে নিরাশ হয়ে রেফার করে দিয়েছেন। মনে প্রচ- আঘাত পেলাম। হযরতের পা জড়িয়ে ধরলাম। খুব কাঁদলাম। বললাম, আপনি কখনও এমনটি করবেন না। আমাকে এমন কথা বলবেন না। আমি যদি এখান থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে যাই, তাহলে আমার সংশোধন হবে কোথায়? হযরত আমাকে সান্ড়্বনা দিলেন। সে সময়টা ছিল আমার জন্যে চরম কষ্টের। তিনদিন আমি থাকলাম। নানা রকমের দুশ্চিন্ড়া আমার মাথায় ভিড় করছিল। বিষয়টি হযরত অনুভব করতে পারেন। আমাকে ডেকে বললেন– হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ সাহেবের কাছে কি তোমার যাতায়াত আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, যাই। তিনি বললেন– যাওয়া উচিত। আমাদের বুযুর্গ। আমি তখন নিজের অবস্থা খোলামেলাভাবে আলোচনা করার জন্যে এলাহাবাদের উদ্দেশে সফর করলাম। ভাবলাম, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ সাহেবের কাছ থেকে কোনো সুপারিশ লিখে নিয়ে আসবো। এলাহাবাদ গিয়ে জানতে পারলাম তিনি সেখানে নেই। প্রতাবগড়ে আছেন। গেলাম প্রতাবগড়ে। শুনলাম দু'দিন আগেই সেখান থেকে চলে গেছেন। গেছেন রানীগঞ্জে। গেলাম সেখানে। সেখানে গিয়ে শুনলাম, একদিন আগে সেখান থেকে তাঁর বাড়ি ফুলপুরে চলে গেছেন। মাগরিবের নামাযের পর রওনা হলাম ফুলপুরের উদ্দেশে। বর্ষাকাল। বৃষ্টির মওসুম। কোনো রকমের যানবাহন নেই। এরই মধ্যে পায়ে হেঁটে রওনা দিলাম।

mv‡ne `v. ev.-Gi AvZ¥Rxebxg~jK mv¶vrKvi

হাঁটতে হাঁটতে এশার সময় গিয়ে উপস্থিত হলাম।

হযরত অসুস্থতা ও দুর্বলতার কারণে ঘরেই নামায পড়ছিলেন। মসজিদের মুয়াজ্জিনের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে ঘরে গেলাম। হযরত যখন জানতে পারলেন, আমি এলাহাবাদ সেখান থেকে প্রতাবগড়, রানীগঞ্জ হয়ে পায়ে হেঁটে ফুলপুর পৌঁছেছি, তখন খুবই খুশি হলেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর লেখা চিঠিপত্রেও তাঁর একান্ড় মমতা এবং ভালোবাসার কথা উলে- খ করেছেন। তিনি আমার প্রতি যে আন্ড়রিকতা, কৃপা ও স্নেহের আচরণ করেছেন সে কথা ভাবতে গেলেও লজ্জায় সংকুচিত হই। রায়বেরেলীর খানকা এবং হযরত (রহ.)-এর নামই ছিল হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ সাহেবের কাছে পরম তৃপ্তির বিষয়। তারপর প্রচ- গরমের মধ্যে সফরের সামান্য কষ্টভোগ হযরতকে আরও আপ- ুত করেছিল। অধমের প্রতি তাঁর মমতা উথলে উঠেছিল। খানাপিনা এবং নামাযের পর আমাকে দ্রুত আরাম করার নির্দেশ দেন। বলেন, সকালে কথা হবে।

প্রশ্ন : এই সফরে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ সাহেবও কি আপনাকে খেলাফত দিয়েছিলেন?

উত্তার : খেলাফতের কথা কী বলবো, হযরতের ঘর ছিল ছাপড়ার মতো। অত্যন্ড় সাদাসিধা খাটিয়া বিছানো। আমি হযরতের কাছে আমার মুরীদ হওয়ার বিস্ড়রিত ইতিবৃত্ত পেশ করি। এও বলি, বড় আশা ছিল হযরতের কাছে মুরীদ হয়ে আমার আত্মার সংশোধন হবে। কিন্তু হযরত আমার প্রতি নিরাশ হওয়ার কারণে আমাকে মসজিদে ডেকে এ কথা বলে দিয়েছেন। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ (রহ.) তখন বললেন, অদৃশ্যের ইশারাতেই বুযুর্গানে দীনের ফয়সালা হয়ে থাকে। তারপর বললেন, হযরত আলী মিয়াকে আসলে মানুষ বোঝে না। একটু পরে বললেন, আসলে সকলেই তার প্রিয় ব্যক্তিকে লুকিয়ে রাখতে চায়। আলী মিয়াকে ইলমের আড়ালে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। তারপর কিছুক্ষণ থেমে থেমে বললেন, আলী মিয়া যদি নিজেকে প্রকাশ করেন তাহলে এই সময়ের পীর সাহেবরা মুরীদ পাবেন না। আমি তখন আমার অবস্থা এবং নিরাশার

কথা বলি। এর পিঠে তিনি বলেন, আচ্ছা, কোনো একটি বিষয় প্রমাণ করার জন্যে কয়টি সাক্ষীর প্রয়োজন? আমি বললাম, স্বাভাবিক বিষয়ে তো দু'জন সাক্ষীই যথেষ্ট। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য চারজনেরও প্রয়োজন পড়ে। মাওলানা বললেন, আচ্ছা, আমার সাক্ষী কি গ্রহণযোগ্য হতে পারে? আমি বললাম, আপনার সাক্ষই যদি গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে কার সাক্ষ গ্রহণযোগ্য হবে? তিনি তখন বললেন, আমিও আপনাকে খেলাফত দিচ্ছি। আল-াহর কোনো বান্দা যদি আপনার কাছে আসে তাহলে তাকে আমাদের সিলসিলায় মুরীদ করে নিবেন। হযরতের মুখে একথা শুনে আমার নিরাশার অন্ধকার আরও ঘনীভূত হলো। সেখান থেকে ফিরে চললাম ফুলাতের উদ্দেশে। পথজুড়ে আমার মনে নানা দুশ্চিন্ড়ার ওড়াউড়ি। মিয়া উমর! প্রতিটি মানুষই তার নিজের অবস্থান থেকে চিন্ড় করতে অভ্যস্ড়। ছোট মানুষের চিন্ড়াও ছোট হয়। আমার বার বার মনে হতে থাকে, আমাদের এলাকায় হযরতের পরিচিতজন খুবই কম। আমাদের অঞ্চলের লোকেরা যদি জানতে পারে কালিম হযরত মাওলানার খলিফা, তখন তাদের মনে হযরতের মর্যাদা কমে যাবে। ভাববে, মাওলানা আলী মিয়ার খলিফা এমন! আমি বিষয়টি নিয়ে অনেক চিন্ড়া করলাম। সিদ্ধান্ড় নিলাম, আচ্ছা! বিষয়টি হাজী আব্দুর রাজ্জাক সাহেব এবং শরাফত খান সাহেব ছাড়া আর কেউ জানেন না। তাদের দু'জনের পা জড়িয়ে ধরবো। তাদের থেকে ওয়াদা নিবো, বিষয়টি যেন তারা কাউকে না বলেন। এতে আমাদের হযরত অন্ড়ত বদনাম থেকে বেঁচে যাবেন। আমি ঠিক এই ধরনের সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে ফুলাতে গিয়ে উঠি। আমার বড় বোন যার হাতে আমার লালন-পালন হয়েছে– এশার নামাযের পর আমাকে এসে বললেন, কালিম! আমি মুরীদ হতে চাই। আমি বললাম, আপু! তুমি হযরতের কাছে চিঠি লেখ। চিঠির মাধ্যমেই মুরীদ হয়ে যাও। তারপর যখন সাথে সাক্ষাৎ হবে তখন বাইয়াত নবায়ন করে নিও। তিনি বললেন, না। আমি তো তোমার কাছে মুরীদ হতে চাই। আমি তার কথায় কিছুটা আশ্চর্যও হলাম এবং কিছুটা রসিকতা করে বললাম– দেখ, মানুষ তো মুরীদ হয় বুযুর্গদের হাতে। কারও সামনে কিন্তু এমন কথা বলবে না। তাহলে মানুষ আমাকে নিয়ে রসিকতা করবে। বলবে, কালিমের বড়

বোনের এতটুকু বুদ্ধিও নেই কার কাছে মুরীদ হতে হয়! আমার বোন জেদ ধরে বসলো। ফলে আমার আশ্চর্যের সীমা রইলো না। মনে মনে খুব পেরেশান হলাম। তারপর আমার মনের ভাব এবং সফরের পুরো কাহিনী হযরত (রহ.) কে লিখে পাঠালাম। হযরত এর জবাব পাঠালেন। জবাবে এই কবিতাটিও লিখেছিলেন–

داداورا قابليت شرط نيست
بلكه شرط قابليت داداوست

অর্থাৎ, আল-াহর দানের জন্যে যোগ্যতা কোনো শর্ত নয়
তবে যোগ্যতার জন্যে আল-াহর দান শর্ত।

এ-ও লিখেছিলেন, আমরা আমাদের শায়খের অনুসরণে যারা আসে তাদেরকে মুরীদ করে নিই। আশায় থাকি, হয়তো তার হাতের কারণে আল-াহ তায়ালা আমাকে মাফ করে দিবেন। তুমিও এই নিয়তেই কেউ আসলে মুরীদ করবে। মনে কিছুটা সান্ড়্না এবং ভরসা পাই। তারপরও নানা প্ররোচনা, দুশ্চিন্ড়া ভেতরে ওড়াউড়ি করতেই থাকে। এক ব্যক্তি মদীনা মুনাওয়ারা যাচ্ছিল। আমি তখন তার হাতে হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.)-এর উদ্দেশে একটি বিস্ড়ারিত চিঠি লিখি। আমার এই দুরবস্থার জন্যে হযরতের কাছে দোয়া প্রার্থনা করি। উত্তরে হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) লিখেন– এই অধম তো প্রথমেই তোমাকে খেলাফত দিয়েছে। হয়তো নিজের অবস্থার কারণে তোমার পেরেশানী হচ্ছিল। বিষয়টি তুমি এভাবে বুঝ, খেলাফত এটা চিকিৎসার সনদ। সুস্থতার সনদ নয়। সুতরাং এখন নিজেরও চিকিৎসা করো, অন্যেরও চিকিৎসা কর। হযরতের এই বাক্যটি পাঠ করার পর মনে অনেকটা সান্ড়্না পাই। তারপর যখন এই খেলাফতদানের সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে নানা ধরনের পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকার সুযোগ হয়, তখন বুঝতে পারি এর মধ্যেও কল্যাণ নিহিত ছিল। সুতরাং এই খেলাফত দান হলো কাউকে পাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে এবং এটা তৃতীয় স্ড়রের খেলাফত।

প্রশ্ন : এর বাইরেও শাম এবং মদীনার দু'জন বুযুর্গ আপনাকে খেলাফত দিয়েছেন। তাঁদের পরিচয় জানতে পারি?

উত্তার : ভাই কথা ছিল, দাওয়াত সম্পর্কে আলোচনা হবে। তুমি আর কতক্ষণ খেলাফত খেলাফত করবে!

প্রশ্ন : মানুষের মধ্যে ভুল তথ্য জানাজানি হওয়ার চাইতে সঠিক তথ্য সংরক্ষিত হওয়া কি ভালো নয়?

উত্তার : তার মানে তুমি এসব কথা সংরক্ষিতও করতে চাচ্ছো?

প্রশ্ন : এখন আমাদের কাছে সংরক্ষিত থাকবে। পরে হয়তো কাজে লাগবে। আচ্ছা, সেই দু'জন বুযুর্গের পরিচয় কি জানতে পারি?

উত্তর : তাদের মধ্যে একজন ছিলেন শায়েখ আহমদ মুজতাবা আলাভী মালেকী কাদেরী। তিনি শায়েখ আলাভী মালেকীর আপনজন। তিনি আসলে শায়েখ আবু তাহের কুরদী মাদানী (রহ.)-এর শিষ্য ও খলিফা। শায়েখ মুহসিন মুকবিল আলাভী, হযরত শাহ ওয়ালীউল-াহ (রহ.)-এর সহপাঠী'র ষষ্ঠ পুশতের কাদেরিয়া সিলসিলার বুযুর্গ। তিনি আমাকে সিলসিলার খেলাফত দানের সময় একটি খান্দানী পাগড়িও দান করেছিলেন। পাগড়িটি সম্পর্কে নানা ধরনের কথা মানুষের মধ্যে প্রচলিত আছে। হযরত শায়েখ আলাভী মালেকী (রহ.) মানুষের মাঝে প্রচারিত সেইসব বরকত হাসিল করার জন্যে পাগড়িটি আমার কাছ থেকে কয়েক দিনের জন্যে নিয়ে নেন। আমি তাঁকে স্থায়ীভাবেই পাগড়িটি হাদিয়া করে দেই। কারণ, আমার দৃষ্টিতে তিনিই এর যথাযোগ্য অধিকারী।

দ্বিতীয়জন হলেন, হিজবুল বাহার- এর লেখক শায়েখ আবুল হাসান শাযালী (রহ.)-এর সিলসিলার বুযুর্গ শায়েখ সালেহ হামুদী শাযালী। তিনি আমাকে হেরেম শরীফের র্কনে ইয়ামানীর সামনে মাতাফে খেলাফত দান করেছেন। তবে এ সবই হচ্ছে তৃতীয় স্ড়রের খেলাফত।

প্রশ্ন : হযরত মাওলানা (রহ.)-এর সান্নিধ্যে আপনি দীর্ঘ সময়

কাটিয়েছেন। এ সম্পর্কিত আমাদের জন্যে উপকারী কোনো কথা জানতে চাই?

উত্তর : এর জন্যে চাই ভালোবাসা এবং পারস্পরিক চিন্ড়ার মিলবন্ধন। আলহামদুলিল-াহ! আমার আল-াহ আমাকে এই দুটো জিনিসই দান করেছেন। হযরত (রহ.)-এর প্রতি আমার ভালোবাসা ছিলো এমন– তাঁর কাছে একটি চিঠি পাঠিয়ে এসে আরেকটি চিঠি লিখতে বসতাম। তেইশ বছরের সম্পর্কের পরিসরে হয়তো এক তৃতীয়াংশ সময় আমি হযরতের দরবারে আসা-যাওয়ার মধ্যে কাটিয়েছি। আমার কাছে হযরত (রহ.)-এর ৪৩২টি চিঠি সংরক্ষিত আছে। তারপরও মন সদা অস্থির থাকতো। মুনাসাবাত ও মানসিক মিলের বিষয়টি ছিল এমন- হযরতের পক্ষ থেকে এসলাহ ও সংশোধনের সাধারণ রীতির বাইরে আমাকে বিভিন্ন বুযুর্গের দরবারে যাওয়ার নির্দেশ ছিল। যে কোনো বুযুর্গের দরবারে হাজির হতাম, তাঁর প্রতি আমার ভক্তি বৃদ্ধি পেত। সেই সাথে বার বার মনে হতো–

آفا قہا گر دیدہ ام مہر بتاں ورزیدہ ام
بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیزے دیگری

অর্থাৎ, ঘুরেছি পৃথিবী, হেরেছি তার রূপ রূপসী যত
হাজার সৌন্দর্যের ভিড়ে তুমি তোমারই মতো।

হযরত (রহ.)-এর সান্নিধ্যে থেকে সবচে’ গভীরভাবে যে জিনিসটি আমি অর্জন করেছি তা হলো– আমার অযোগ্যতার উপলব্ধি। অনেক সময় তো এই চিন্ড়া আমাকে চরমভাবে পরাজিত করে রাখতো। হযরত (রহ.) তাঁর অধিকাংশ চিঠিতেই এমনকি সাক্ষাতেও আমাকে বার বার বলতেন, চিঠিতে তোমার অবস্থা পড়ে নিজের অবস্থার কথা ভেবে লজ্জিত হই। আল-াহ তায়ালা তোমাকে কত উত্তম আত্মিক অবস্থায় ভূষিত করেছেন। আর আমি এসব বাক্য পড়ে যারপরনাই লজ্জিত হতাম। ভাবতাম শায়খুল আরব ওয়াল আজম যিনি, তিনি নিজেকে কিভাবে চিন্ড়া করেন! আর আমাদের অবস্থা কী! লজ্জায় আমার সর্বাঙ্গ গলে যেতো।

আক্ষেপ হতো, আমাদের প্রতি এমন যাদের কর“ণা, তাদের কর“ণার উপলব্ধিই বা কোথায়?

প্রশ্ন : হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) কি আপনাকে ফুলাত মাদরাসার খেদমতে নিযুক্ত করেছিলেন?

উত্তার : আসলে হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) ফুলাতকে গভীর ভালোবাসতেন। হযরত মাওলানা এহতেশামূল হাসান কান্ধলভী (রহ.)-এর সাহেবজাদা হযরত মাওলানা এহতেরামূল হাসান ফুলাত থাকতেন। ফুলাতে তার অবস্থানের কথা জেনে হযরত আনন্দিত ছিলেন। কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত কারণে তিনি এখান থেকে চলে যান। যখনই প্রসঙ্গটি উঠতো হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) বলতেন, এহতেরাম! তুমি কাজটি ভালো করোনি। ফুলাতের কাছে আমার অনেক আশা ছিল। তারপর হযরতের দরবারে আমার যাতায়াত শুর“ হয়। এদিকে দার“ল উলূম দেওবন্দে শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মহাসম্মেলনের পর সেখানে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়। আমি আমার হযরতের সাথে দেখা করার জন্যে দেওবন্দ যাই। দেওবন্দে তখন মজলিসে শুরার বৈঠক হচ্ছিল। আসলে আমি আগে মনে করতাম, আলেমগণ হলেন মাসুম এবং নিষ্পাপ শ্রেণী। তাই আলেমগণের মাঝে যখন মতের বিরোধ দেখতে পেলাম তখন আমার বিস্ময় এবং আক্ষেপের সীমা রইলো না। মূলত সে সময় আমি আমার হযরতকে পানি ছাড়া মাছের মতো ছটফট করতে দেখেছি। আমি একবার হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) কে বিষয়টি বলি। আমি বললাম, হযরত আমি বুঝিনি! হযরত বললেন, গোড়া হলো ফুলাত। আর সবই হলো শাখা-প্রশাখা। কয়েকবারই এধরনের কথাবার্তা হয়। একবার হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ প্রতাবগড়ী (রহ.)ও এ বিষয়ে আমাকে নির্দেশনা দেন। আমি তখন মাদরাসার জন্যে চেষ্টা শুর“ করি। তারপর যখন দার“ল উলূম দেওবন্দে বিরোধ সৃষ্টি হলো, তখন আমি খুবই প্রভাবিত হলাম। ভাবতে লাগলাম, এমন মুখলেস আওলিয়ায়ে কেরামের হাতে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আজ এত সংকট, আমার মতো ভেতরে বাইরে

উভয় বিচারে অন্ধকার যদি কোনো প্রতিষ্ঠান করে তাহলে তো সেখানে মন্দ ছাড়া আর কিছুই হবে না। এই চিন্ড়া থেকে আমি হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.)-এর খেদমতে ফেব্র"য়ারি মাসে মদীনা মুনাওয়ারায় একটি চিঠি লিখি। চিঠিতে আমার অপারগতার কথা বলি। হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) সঙ্গে সঙ্গেই আমার চিঠির জবাব দেন। চিঠিতে তিনি লিখেন, প্রকৃতকর্তা তো আল-াহ। বান্দার কাজ সামান্য চেষ্টা করা। সে চেষ্টার দ্বারাই পুরস্কারের অধিকারী হয়। জীবনের এই সন্ধ্যায় এসে যখন আমার পা মৃত্যুর সিঁড়িতে তখন প্রতিনিয়তই পূর্ব সূরির প্রতি আমার ভালোবাসা ক্রমাগত বাড়ছে। ফুলাতের পুর্বসূরিগণ হলেন আমাদের পূর্বসূরি কাফেলার অগ্রপথিক। আমার মনের একান্ড় কামনা– সৎ লোকদের নিবাস ফুলাতের এলমী ঐতিহ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হোক। এ বিষয়ে কর"ণাময় আল-াহ তায়ালার দরবারে আমার অনেক আশা। এই অধম মনে করে, যদি কোনো অমুসলিমও এই মোবারক জনবসতিতে কোনো দীনি কাজ করার জন্যে সচেষ্ট হয়, তাহলে আল-াহ তায়ালা তাকেও বঞ্চিত করবেন না। এই ধরনের সাহস জাগানিয়া পত্র পাওয়ার পরও মূলত হীনমন্যতার কারণে আমি হিম্মত করতে পারছিলাম না। কিন্তু যখন সে বছরই এপ্রিলে হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) এন্ড়েকাল করলেন তখন আমার মনোকষ্টের আর সীমা রইলো না। বার বার হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.)-এর কথা মনে পড়তো। হযরতের চিঠিগুলো বের করে পড়লাম। চিঠি পড়ে আবেগে উদ্বেলিত হলাম। মাদরাসার জন্যে আবার চেষ্টা শুর" করলাম। শুনে আমাদের হযরত খুবই খুশি হলেন। সাহস দিলেন। মাদরাসার নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখলেন– জামিয়াতুল ইমাম ওয়ালীউল-াহ। হযরত গাঙ্গুহী (রহ.)-এর রাখা নামের সম্মানে ফয়জুল ইসলাম নামে একটি বিভাগ রাখা হয়।

প্রশ্ন : দাওয়াতী কর্মে কিভাবে এলেন? দীর্ঘ দিন পর্যন্ড় আপনি ধর্মত্যাগী মুসলমানদের মাঝে কাজ করছেন। তারপর কিভাবে অমুসলিমদের মাঝে কাজ করতে শুর" করলেন, জানতে পারি?

উত্তর : এখন তুমি ঠিক জায়গায় এসেছো। আমাদের হযরত কিভাবে যেন জানতে পারলেন, সুনিপথের কাছে ভারত বিভাগ এবং বস্ড়ি বদলের সময় লড়াই দাঙ্গাই প্রভাবিত হয়ে অনেক মুসলমান ধর্ম ত্যাগ করে বসে। হযরত (রহ.) আমাকে প্রকৃত বিষয়টি জানার জন্যে আদেশ দেন। সুনিপথ ফুলাত থেকে অনেক দূরে নয়। আমি আমার কয়েকজন বন্ধু নিয়ে সেখানে যায়। সেখানে গিয়ে দেখি অনেক মুশরিক এখন মন্দির গুর"দুয়ার এমনকি জানোয়ারের বসতিতে রূপান্ড়রিত। এই অবস্থা দেখে আমরা অনেকটা উন্মাদের মতো হয়ে যায়। বিষয়টি হযরতকে জানাই। হযরত আমাদেরকে কাজ করার আদেশ দেন। নানাভাবে সহযোগিতা করেন। দুই বছর পর্যন্ড় আমরা সেখানে সার্ভে করতে থাকি। নানাভাবে চেষ্টা করতে থাকি। ১৯৯০ সালের কথা। আদভানীর রথ যাত্রার কালে আমাদের দু'জন বন্ধু মাষ্টার জিয়াউদ্দীন বিজনূরী এবং হাফেজ নাসিম দিনাজপুরীকে এলাকার ডাকাতদের একজন সরদার মসজিদের মধ্যে শহীদ করে ফেলে। তারপর তাদের লাশ নদীতে ফেলে দেয়। হত্যায় অংশ গ্রহণকারী খুনিদের চারজনের তিনজন স্বপ্নে মাষ্টার জিয়াউদ্দীন সাহেবের দাওয়াতে মুসলমান হয়ে যায়। এই দু'জনের শাহাদাতের পর আলহামদুলিল-াহ- ৪৭-এ যারা ইসলাম ছেড়ে দিয়েছিলো তারা আবার মুসলমান হতে থাকে। সেখানে ইসলামের জয়ের দ্বার উন্মোচিত হতে থাকে। এখানে কাজ করার সময় হযরত আমাদেরকে নানাভাবে উৎসাহিত করতেন। অন্ড়ত দু'বার বলেছেন, সুনিপথে খুবই সস্ড়ায় বেহেশ্ত এবং আল-াহর সন্তুষ্টি পাওয়া যায়। তারপর আল-াহ তায়ালা পাঞ্জাব, রাজস্থান, মথুরা, আগ্রা, দিলি-, হিমাচল প্রভৃতি অঞ্চলে কাজের ক্ষেত্র তৈরি করে দেন। স্কুলের নামে নানা মাদরাসা গড়ে ওঠে। এসব অঞ্চলে দীনি দাওয়াতের জন্যে সবচে' উপযুক্ত পন্থা ছিল এটা। আলহামদুলিল-াহ! গ্রামের পর গ্রাম তাওবা করে পুনরায় ইসলাম ধর্মে ফিরে আসে। এসবই ছিল আমাদের হযরতের বরকত। প্রথম দিকে হযরত যখন আমাকে সুনিপথে কাজের নির্দেশ দেন তখন আমি নিজেও ছিলাম বিস্ময়-বিভোর। আমার মতো একজন গোঁয়ারকে দিয়ে এ কাজ! কিন্তু হযরত রায়পুরী (রহ.)-এর একটি বাণী শুনেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, মুরীদ হওয়ার মজা হলো ফুটবল হওয়ার মধ্যে। এই বাণীটি

স্মরণ করলাম। সাহস সঞ্চার করলাম। তারপর ফুটবল হওয়ার বরকত নিজ চোখে দেখতে লাগলাম।

প্রশ্ন : অমুসলিমদের মধ্যে দাওয়াতের কাজ কিভাবে শুর" করলেন? কিভাবে এ পথে এলেন একটু বিস্ড়ারিত জানতে পারি?

উত্তর : আসলে এর পিছনে দুটি কারণ ছিল। একটি জাহেরী আরেকটি হাকিকী। হাকিকী বা প্রকৃত কারণ হলো– আমার হযরতের মা হযরত খাইর"ননেসা (রহ.) ছিলেন একজন মুসতাজাবুতদাওয়াত অলি। তিনি আমার হযরতকে নানা রকমের দোয়া দিয়েছেন। তিনি আমার হযরতের জন্যে সবচে' বেশি যে দোয়াটি করতেন তা হলো– আলী! তোমার হাতে যেন দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। আমার হযরতের জন্যে আল-াহ তায়ালা এই দোয়া কবুল করেছিলেন। একটি মাধ্যম হয়ে সেই দোয়ার অধিকারী হই আমি। ছয় সাতটি চিঠিতে হযরত আমাকে লিখেছেন। দু'বার মুখে বলেছেন। একবার দিলি- বাওয়ানায় ৪ হাজার ডোম মুরতাদ নর-নারী রাত একটা বাজে দলবদ্ধভাবে তাওবা করে নতুন করে ঈমান আনে। তাদের নাম পরিবর্তন ইত্যাদি শেষ করতে করতে রাত আড়াইটা বেজে যায়। আমার আনন্দের আর সীমা থাকে না। এটাই ছিল এত বড় জনগোষ্ঠীর দলবদ্ধভাবে ঈমান নবায়নের প্রথম ঘটনা। তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়ি। স্বপ্নে হযরত (রহ.)-এর জননীকে দেখতে পাই, তিনি একটি পালঙ্কে উপবিষ্ট। মাথায় সম্রাজ্ঞীর তাজ। আমি কাছে যাই। মাথায় হাত রেখে দোয়া করার জন্যে অনুরোধ করি। তখন তিনি কোমরে হাত রেখে বলেন, তুমি কি মনে করছো! এ তো আমার দোয়ার ফসল। তোমার দাওয়াতের জয় নয়। স্বপ্নটি আমি হযরত (রহ.) কে লিখে জানাই। হযরত (রহ.) জবাবি চিঠিতে লিখেন, আমার মা আমার জন্যে সবচে' বেশি এই দোয়াটি করতেন, আলী! তোমার হাতে যেন মানুষ দলে ইসলাম গ্রহণ করে। আমার মাধ্যম হয়ে আল-াহ তায়ালা এই দোয়া তোমার জন্যে কবুল করেছেন। আমার অভিজ্ঞতা হলো, আমি কয়েকজন বড় মানুষকে দেখেছি। তারা দাওয়াত শেখার জন্যে, দাওয়াতের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্যে এসেছেন। কয়েকজন তো এ পথে বছরের পর বছর কাটিয়ে

দিয়েছেন। কিন্তু একজনও তাদের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেনি। কারও কারও ক্ষেত্রে এমনটিও ঘটেছে। স্বেচ্ছায় তাদের কাছে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে এসেছে। কিন্তু তারা তাদেরকে কালেমা পড়াননি। তারপর তাঁরাই যখন হযরত (রহ.)-এর সিলসিলাভুক্ত হলেন তখন মানুষ তাঁদের হাত ধরে মুসলমান হতে লাগলো। আমার মনে হয় এ ক্ষেত্রে মূল উৎস হলো আমাদের হযরত এবং তাঁর মায়ের মনের দোয়া। আমার হযরতও আমাকে অনেক দোয়া দিয়েছেন। এক বছর তো রমযানমাসব্যাপী নাম নিয়ে আমার জন্যে সম্মিলিতভাবে দোয়া করেছেন। হযরত আমাকে এও বলেছেন, আমি অজিফা মনে করে নিয়মিত নাম নিয়ে তোমার জন্যে দোয়া করি।

এ পথে আসার আমার আরেকটি কারণ হলো– যেটাকে আমি জাহেরী কারণ বলেছি, আমার কন্যা। এমনিতে যাকে দিয়ে যে কাজ হবে তার কোনো না কোনো লক্ষণ আগে থেকেই দেখা যায়। আমার ছেলেবেলাতেই এক কুমার ছেলেসহ কয়েক ব্যক্তি এই অধমের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তবে এই কাজের প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে আমার মেয়ে আসমা। ঘটনাটি আমাদের হযরতও তাঁর কয়েকটি আলোচনায় বলেছেন।

১৯৯০ সালের ৩০ অক্টোবর। আদভানীর ডাকে রাম মন্দিরের রথযাত্রার আন্দোলন চলছে। চারদিকে ভয়াবহ দাঙ্গা। সেপ্টেম্বর মাসের কথা। আমাদের ঘরে একজন মহিলা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে একজন মহিলা নিয়মিত আসতো। তার নাম ছিল বালা। সে নিজেও খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতো। তার সাথে ঘরের শিশুদের ভালো সম্পর্ক ছিল। একটি কক্ষে বসে আমি কোনো একটি বই পড়ছিলাম। আমার মেয়ে আসমার বয়স তখন হয়তো আট বছর হবে। বৃষ্টির কারণে কাঁচা ফলমূল এক পাশে রেখে বৃষ্টি থামার অপেক্ষা করছিল বালা। ঠিক গ্যালারিতেই আমার মেয়ে অত্যন্ড় গোপন কথা বলার ভঙ্গিতে তার সাথে একান্ড়ে আলাপ করতে লাগলো। বিষয়টি আমার নজরে পড়লো। ভাবলাম, চারদিকে পরিবেশ খুবই ভয়াবহ। কোন কথা থেকে আবার কী হয়ে যায়– এই ভয়ে আমি

mv‡ne `v. ev.-Gi AvZ¥Rxebxg~jK mv¶vrKvi

কান পেতে তাদের কথা শুনতে লাগলাম। শুনলাম, আসমা বালাকে বলছে, বালা, তুমি একজন কত্ত ভালো মানুষ! তুমি আরেকটু ভালো হয়ে যাও না! বালা বললো, সেটা কিভাবে? আসমা বললো, বালা, তুমি কার পূজা করো? বালা বললো, ভগবানের মূর্তির। আসমা বললো, এই মূর্তি কি তোমাকে কিছু দিতে পারবে? তোমার কোনো উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারবে? আমার তো ভয় হয়, তুমি যদি হিন্দু অবস্থায় মারা যাও, তাহলে নরকে জ্বলবে। বালা তুমি নরকের আগুন কিভাবে বরদাশত করবে?

আমি শুনে আশ্চর্য হই, এমন একজন ছোট্ট শিশু কিভাবে কুরআনের ভঙ্গিতে একজন মেয়েকে দীনের দাওয়াত দিচ্ছে! আমি তখন অলক্ষে বাইরে চলে আসি। বালা আমাকে দেখে সেখান থেকে চলে যায়। আমি আমার মেয়ের দিকে তাকিয়ে দেখি তার চোখে পানি। আমি একান্ড় মমতায় তাকে প্রশ্ন করি, আসমা! তুমি বালার সাথে কি কথা বলছিলে? সে আমাকে বললো, আব্বু! বালা কত ভালো মেয়ে। আমাদেরকে কত ভালোবাসে? এ দোযখে জ্বলবে! আব্বুজি, তার কত কষ্ট হবে! এ কথা বলে সে আমার বুকে পড়ে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে। আমি দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত কুরআন পাঠ করি। তার এই অবস্থা দেখে কে যেন আমার ভেতর থেকে তেলাওয়াত করে উঠলো–

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ

অর্থ : 'আপনি হয়তো তারা ঈমান আনছে না বলে নিজেকে ধ্বংস করে দিবেন'। (শুআরা : ৩)

হযরত রাসূলে কারীম সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর পুরো জীবন-চরিত ভিডিওর মতো আমার আত্মায়, আমার চেতনায় ভেসে উঠতে থাকে। মনে হতে থাকে, আমরা কেবল ডানদিক থেকে জুতা পরিধান করা মিষ্টি খাওয়া এবং লাউ খাওয়ার অনুসরণ করেই নিজেদেরকে সুন্নতের অনুসারী বলে দাবি করে বসছি। আসল সুন্নাত তো হলো নবীর দরদ। ওফাত পর্যন্ড় এক মুহূর্তের জন্যেও যে দরদ থেকে মুক্ত হতে পারেননি আমাদের প্রিয়তম নবী সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম। আমরা তাঁর কেমন অনুসারী হলাম! আমাদের মাঝে সেই দরদের বিন্দুমাত্র নেই।

হযরত হাজী ইমদাদুল-াহ মুহাজেরে মক্কী (রহ.)-এর বার বার পড়া একটি বাণী মনে হতে লাগলো। বাণীটি হযরত থানভী (রহ.) বর্ণনা করেছেন। উলামায়ে কেরামের মজলিসে একবার হযরত হাজী সাহেব (রহ.) বলেছিলেন, ভাই! তোমরা কুতুব হতে চাও? উপস্থিত লোকেরা বললো, অবশ্যই। হযরত তখন বললেন, আমি তোমাদেরকে কুতুব হওয়ার একটি সহজ উপায় বলে দিচ্ছি। যখন কোনো অমুসলিম মারা যায় তখন সামান্য সময় একাকী বসে কাঁদবে। ভাববে, আমাদের এক ভাই অনন্ড়কালের জন্যে দোযখে চলে গেলো। আমরা তার জন্যে একটু চিন্ড়াও করতে পারলাম না। যদি এটা করতে পারো, তাহলে কুতুব হয়ে যাবে। মনে হলো কুতুব হওয়াই তো নবুওয়াতের উত্তরাধিকার। সেই তো নবীর উত্তরাধিকারী, যার মধ্যে রয়েছে নবীর দরদ। আমার চিন্ড়া-চেতনা স্পন্দনহীন হয়ে পড়ে। পরের দিন আমার হরিয়ানা সুনিপথে যাওয়ার কথা। এক যুবক আমাকে খুব ভালোবাসতো। এক পূজারীর পুত্র রাজকুমার। আমি রাজকুমারকে বললাম, তুমি আমাকে এতো ভালোবাস! যদি কালেমা না পড় তাহলে তো এই ভালোবাসা অর্থহীন! আট নয় মিনিট আমি তাকে ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে বললাম। সে কালেমা পড়ার জন্যে রাজি হয়ে গেলো। কালেমা পড়লো। আরেক শর্মাজি আসার কথা ছিল। তিনিও এলেন। সামান্য কথা বলার পর তিনিও মুসলমান হওয়ার জন্যে রাজি হয়ে গেলেন। সন্ধ্যায় এক গ্রামে প্রোগ্রাম ছিল। সেখানে গাড়িতে ফুঁ নিতে আসা তৃতীয় আরেক ব্যক্তি সামান্য কথা বলার পর মুসলমান হয়ে গেলো। অল্প সময়ের ভেতরে তিন জন ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বেঁচে গেলো। ঘটনাটি আমাকে দারুণভাবে নাড়া দিলো। তারপর আমি নতুন করে কুরআনে কারীম এবং প্রিয়নবী সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর জীবন-চরিত পড়তে শুরু করি। বিষয়টি যখন মানুষকে বলতে শুরু করি, তখন তারাও কাজের জন্যে দাঁড়িয়ে যেতে থাকে।

আল-াহ তায়ালা তারপর আরও কয়েকবার আমার আবেগের স্পন্দন ও সঞ্চালন সৃষ্টি করার জন্যে আসমাকে উপলক্ষ বানিয়েছেন। দুই তিন বছর পরের কথা। শাবান মাসে মাদরাসার দায়িত্বশীলদেরকে প্রত্যয়নপত্র

mv‡ne `v. ev.-Gi AvZ¥Rxebxg~jK mv¶vrKvi

দেয়ার জন্যে আমি ঘরে লেটারপ্যাড নিতে এসেছি। আসমা আমাকে দেখে এগিয়ে এলো। বললো, আব্বুজি! আপনার সাথে আমার জর“রি কথা আছে। ছয় মাস হলো আপনার কাছে কথা বলার কোনো সুযোগই পাচ্ছি না। তার কথাটি আমার মনে দাগ কাটলো। আমি আবেগের সাথে বললাম, মা, তুমি কী বলতে চাও। এখনই বলো। সে বললো, অত্যন্ড় দরকারি কথা। আমি খুবই পেরেশান। আমাকে নিরিবিলি সময় দিতে হবে। আমি বললাম, এখনই বলো। সে বললো, না, এখন তো আপনি অপেক্ষমান মেহমানদের কাছে যাচ্ছেন। আমি বললাম, না, এখন যাবো না। তুমি ধীরে-সুস্থে তোমার কথা বলো। এক দুইদিন আমি তোমাদের কাছে থাকবো। সে বললো– আব্বুজি, বলুন তো এই কাফের মুশরিক এবং অমুসলিমরা কি চিরকাল দোযখে জ্বলবে? আমি বললাম, হ্যাঁ, চিরকাল দোযখে জ্বলবে। সে বললো– আব্বু! চিরকাল জ্বলবে না। দুই, তিন বছর একশ', তিনশ' বছর হয়তো জ্বলবে। তারপর আল-াহ তায়ালা হয়তো বলবেন, যাও, মাফ করে দিলাম। আমি বললাম– না, তারা চিরকাল দোযখে জ্বলবে। আল-াহ তায়ালা তাঁর কালামেই বলেদিয়েছেন। সে বলল– আল-াহ তায়ালা বলুন আর নাই বলুন, তারা চিরকাল দোযখে জ্বলবে না। আল-াহর নাম রহমান এবং রহীম নয়? মায়ের চাইতে সত্তরগুণ বেশি মমতা আল-াহর। আল-াহ তায়ালা শেষমেশ বলবেন– চলো, এবার মাফ করে দিলাম। একশ' দুইশ' কিংবা পাঁচশ' বছর পর আল-াহ তায়ালা তাদেরকে দোযখ থেকে বের করে দিবেন। আমি বললাম, আল-াহ তায়ালা তো মিথ্যা বলেন না। তিনি তাঁর কালামে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন–

اِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرِكَ بِهٖ□ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

অর্থ : 'আল-াহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করবেন না।

এর বাইরে যাকে খুশি ক্ষমা করে দিবেন।' (নিসা : ৪৮)

এখন সে কিছুটা বুঝতে শুর“ করেছে। কুরআনে কারীমের আয়াত শুনে সে খুবই হতাশ হলো। বললো- এদের কি দোষ? আমাদের

আল-াহই তো তাদেরকে হেদায়েত দেননি। এমন একজন ছোট্ট খুকিকে আমি তাকদীরের কথা কিভাবে বুঝাবো? কথার বাঁক ঘুরাবার জন্যে আমি তাকে বললাম- মা, আল-াহ তায়ালা তোমাকে হেদায়েত দান করেছেন। তোমার উচিত সে জন্যে আল-াহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করা। আমার কথায় সে খুবই চিন্ড়িত হলো। আবেগে দরদর করে চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগলো। বলতে লাগলো- আব্বু, একথা মাঝে মধ্যেই আমার মনে জেগে ওঠে। আমি দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ড় দোয়া করি। অনেক রাত পর্যন্ড় আমার ঘুম আসে না। আমি কাঁদি- হে আল-াহ! তুমি কাউকে দোযখে জ্বালিও না। সকলের পরিবর্তে আমাকে জ্বালিয়ে দিয়ো। এই নিষ্পাপ শিশুর চোখের পানি আমার পুরো অস্ড়িত্বকে চরমভাবে ঝাঁকুনি দেয়। ঘুরেফিরে বার বার তার এই কথাটি 'সকলের পরিবর্তে আমাকে জ্বালিয়ে দিয়ো'- আমার চিন্ড়ায় অন্ড়রে অনুকরণিত হতে থাকে। এ তো এক অবুঝ শিশুর কথা। তার মূল প্রার্থনা হলো– একজন মানুষও যেন দোযখে না যায়। এটাই আমাদের নবী সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর সবচে' বড় দরদ। এই দরদ ছাড়া কোনো ঈমানদার রহমতের নবীর সত্যিকারের অনুসারী হতে পারে না। এরপরও বিভিন্ন সময় এই শিশুকন্যা আমাকে আমার সংগ্রামে প্রেরণা যুগিয়েছে। দৃশ্যত কারণ হিসেবে আমি আমার এই কন্যাকে মনে করি– সেই আমার দাওয়াতি সংগ্রামের শিক্ষক।

প্রশ্ন : এ পর্যন্ড় আপনার হাতে কতজন ইসলাম গ্রহণ করেছেন বলতে পারেন?

উত্তর : যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি তাদের সংখ্যা তো অনেকটা নিশ্চিত করে বলতে পারি। প্রায় সাড়ে চারশ' কোটি । এরা সকলেই আমাদের রক্তের ভাই। হাজার হাজার রক্তের ভাই প্রতিদিন কালেমা ছাড়া মৃত্যুবরণ করছেন। সে তুলনাই যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদের সংখ্যা অনেকটা শুন্যের কাছাকাছি। অমুসলিম যারা রয়ে গেছে তাদের তুলনায় এটা কোনো উলে-খ করার মতো সংখ্যা নয়।

প্রশ্ন : মানুষ বলে, প্রচ‌ন্ড প্রতিকূল পরিবেশে আপনি দাওয়াতি কাজ করে যাচ্ছেন। তারা আশ্চর্য হয়, এ বিষয়ে আপনি কিছু বলুন।

উত্তর : আমি প্রায় প্রতিটি মজলিসে এ কথা বলি, এখন দাওয়াতের পরিবেশ প্রতিকূল নয়। আল-াহ তায়ালা কুরআনে কারীমে বলেদিয়েছেন–

لَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ

অর্থ : ‘যেন তিনি সকল দীনের উপর ইসলামকে জয়ী করতে পারেন ....(সফ : ৯)

এটা আল-াহ তায়ালার অঙ্গীকার। আমাদের সত্যবাদী নবী সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম জানিয়েছেন, কাঁচা-পাকা প্রতিটি ঘরে ইসলাম পৌঁছাবে। আমার মনে হয়, সেই সময় এখন উপস্থিত। আল-াহ তায়ালার পক্ষ থেকে হেদায়েত নেমে এসেছে। মানুষ কাজে নেমে পড়েছে। দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করছে। রমযানের এই বরকতপূর্ণ প্রহরে আল-াহর ঘরে বসে একশ’ ভাগ সত্য প্রকাশের খাতিরে আরজ করছি এবং এটা কোনো বিনয় কিংবা নিজেকে ক্ষুদ্রকরে প্রকাশ করার মানসিকতা থেকে বলছি না– এই অধম দাওয়াতের অ আ-ও জানে না। এক সময় আমার স্মৃতিশক্তির খ্যাতি ছিল। কিন্তু গত কয়েক বছরে সর্দি-কাশি-হাঁচি এসব কারণে স্মৃতিশক্তি অনেকটাই ভেঙ্গে পড়েছে। যখন নদওয়ায় পড়তে যাই তখন মাওলানা শাহবাজ সাহেব এবং মাওলানা আরিফ সাহেব (রহ.) বলতেন, এই নাহু সরফ তো তোমার পড়াই আছে। এখন আবার আমাদের সময় নষ্ট করছো কেন? অথচ এখন আমার অবস্থা হলো– কুরআন শরীফের আয়াতগুলোর বৈকারণিক বাক্য বিন্যাসও আমার কাছে জটিল মনে হয়। মাঝে মধ্যেই বিপাকে পড়ে যায়। যবর পড়বো না যের পড়বো। একসময় আমার ইংরেজি ছিল উপমা দেয়ার মতো। আর এখন হলো ছোট ছোট শব্দও ভুলে যায়। স্বভাবগতভাবে আমি অত্যন্ড় ভীতু এবং দুর্বল চিত্তের মানুষ। অলসতা, দুর্বলতা আমার এতটাই গভীরে প্রোথিত, মানুষের নাম শুনেও ভয় পাই। অন্ধকার কামরায় বাক্সের উপর বিছানাপাতা। তার উপর যখন চাঁদর বিছিয়ে গরমের মধ্যে র‌ন্দ্ধকক্ষ ঘরে শুই তখন কিছুটা নিশ্চিত হই, এখন হয়তো আর কেউ আসবে না।

কোথায় যেন এক আল-াহ ওয়ালার দোয়া শুনেছি কি পড়েছি– তিনি পনের বছর পর্যন্ড় মকবুল অজিফা এবং দোয়ার মতো এই প্রার্থনা করেছেন– হে আল-াহ! আপনি ছাড়া আর কেউ যেন আমাকে না জানে। আর আমিও যেন আপনাকে ছাড়া আর কাউকে না জানি।

বলবার উদ্দেশ্য হলো, আমি সব বিচারেই অযোগ্য। তারপরও দাওয়াতের সুবাধে আমার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। আরমোগানে ভাগ্যবান নওমুসলিমদের রিপোর্ট ছাপা হচ্ছে। তাদের সাক্ষাৎকার সংকলন আকারে প্রকাশিতও হয়েছে। তাতেও সত্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে এই অধম লিখেছে– যাদের ইসলাম গ্রহণের সাথে আমাদের নামও প্রকাশিত হয়েছে, আসলে তাদের ইসলাম গ্রহণের মধ্যে আমাদের দাওয়াতী চেষ্টা কিংবা যোগ্যতার কোনো হাত ছিল না। আমাদের অপরাধ শুধু এইটুকু, বছরের পর বছর যারা ইসলামের পিপাসাই নানাদোয়ারে উপেক্ষিত হয়েছে আমরা তাদেরকে কালিমা পড়িয়ে দিই। আমরা বরং ভেবেছি, এতে করে আমাদের একাউন্ট ভারী হবে। এই ভাবনা থেকেই আমরা কালিমা পড়িয়েছি। আইনি কাগজপত্র তৈরির পথ দেখিয়ে দিয়েছি। সুতরাং নিজে থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদের সংখ্য ও অনেক। এই পরিস্থিতে পরিবেশকে প্রতিকূল বলা কোনো ভাবেই সঙ্গত নয়।

প্রশ্ন : অমুসলিম সংগঠনসমূহ কিংবা সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে আপনি কোনো সংকটের মুখোমুখি হয়েছেন?

উত্তর : আমাদের দেশ বরং পৃথিবীর প্রতিটি দেশের সংবিধান যে কাউকে যেকোনো ধর্ম কবুল করার-মানার এবং ধর্মের দাওয়াত দেয়ার অধিকার দিয়েছে। সুতরাং আমাদের এই কাজ অসাংবিধানিক এবং বেআইনি নয়। তাহলে সংকটের মানে কি! অমুসলিমদের পক্ষথেকে বিরোধিতা– এ বিষয়ে হযরত (রহ.)-এর ভাষায় বলবো, এক্ষেত্রে আমরা সৌভাগ্যবান। আল-াহ তায়ালা আমাদেরকে এমন একটি দেশে দীনের দা‘য়ী বানিয়েছেন যেখানকার লোকেরা তাদের অন্ড়রের ভালোবাসার টানে তাদের কল্যাণকামীকে ভক্তিতে সীমা ছাড়িয়ে যায়। এ জাতি তাদের

mv‡ne `v. ev.-Gi AvZ¥Rxebxg~jK mv¶vrKvi

কল্যাণকামীকে দেবতা বানিয়ে পূজা করতেও ছাড়ে না। এখানে কোনো দা'য়ী কিংবা কল্যাণকামীর বিরোধিতা হয়েছে এমন কোনো নজীর আমাদের ইতিহাসে নেই। প্রায় পাঁচ বছর হলো আমরা আমাদের বন্ধুদের জন্যে নানা প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের আয়োজন করছি। এর মধ্যে আমাদের বিরোধিতা হয়েছে– এমন একটি ঘটনাও আসেনি। একটি ঘটনাও এমন পায়নি যাকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে সে মুখে 'উফ্' শব্দ বলেছে। বরং যতটুকু আমাদের গোচরে এসেছে, আমাদের দা'য়ী বন্ধুরা মন্দিরে ধর্মীয় সাংগঠনিক অফিসে এবং থানায় যায়। সকলেই তাদেরকে ভক্তির সাথে গ্রহণ করে। মাঝে মধ্যে ইনকোয়ারিও আসে। যারা জানতে পারে এরা মানুষকে ধর্মভ্রষ্ট করেছে। প্রথমে অসন্তুষ্ট হয়। তারপর যখন মমতা এবং ভালোবাসার সাথে তাদেরকে দাওয়াত দেয়া হয়, তারাও মুসলমান হয়ে যায়। এরকমের অনেক ঘটনা আরমোগানে ছাপা হয়েছে। তাছাড়া আল-াহ তায়ালা ভয় ও আশঙ্কা থেকে বাঁচার উপায় কুরআনে কারীমের মধ্যেই বলেদিয়েছেন–

اَ لَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسَالٰتِ اللهِ وَ يَخْشَوْنَه وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّااللهَ وَكَفٰي بِاللهِ حَسِيْبًا

অর্থ : 'যারা আল-াহর পয়গাম পৌঁছে দেয় এবং আল-াহকে ভয় করে আর একমাত্র আল-াহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না, হিসেব গ্রহণকারী হিসেবে আল-াহ তায়ালাই যথেষ্ট'। (আহযাব : ৩৯)

আল-াহ তায়ালা আরো বলেছেন–

وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

'আল-াহ তায়ালাই তোমাকে মানুষের হাত থেকে হেফাজত করবেন'।

সুতরাং হেফাজতের অঙ্গীকার তো আল-াহর পক্ষ থেকেই রয়েছে।

প্রশ্ন : মানুষ বলে, পরিবেশ প্রতিকূল। এটাও সত্য, ইসলামের বির"দ্ধে যতটা প্রোপাগা"া চলছে, ঠিক ততটা দ্র"ততার সাথেই পশ্চিমা বিশ্বে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ছে। এর কী কারণ বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : ওয়াশিংটন পোস্টের একজন প্রতিনিধি হুবহু এই প্রশ্নটিই আমাকে করেছিল। আমি তাকে বলেছিলাম এবং বাস্তবতাও তাই– একটা সময় ছিল যখন মানুষ মুসলমানদেরকে দেখে ইসলাম বুঝতো। কিন্তু প্রচার মাধ্যমের ব্যাপকতার কারণে বিশেষ করে ইন্টারনেট আসার পর কুরআনের ইসলাম মানুষের বেডর"ম পর্যন্ড় পৌঁছে গেছে। ফলে মানুষ ইসলামের প্রকৃত রূপকে জানতে পারছে এবং ইসলাম গ্রহণে ধন্য হতে পারছে।

প্রশ্ন : এখনও অনেক মানুষ বিশেষ করে আমাদের আলেমগণ দাওয়াতের প্রতি বিশেষ মনোযোগী নন। এর জন্যে কী করা উচিত বলে মনে করেন?

উত্তর : এটা আসলে শয়তানের একটা ফাঁদ। শয়তান চায় মানুষকে এই বলে পাকে ফেলে রাখতে– অমুক এটা করেনি, তমুক ওটা করছে না। হযরত মসীহুল উম্মত (রহ.)-এর একটা কথা বার বার মনে পড়ে। তিনি বলতেন, অতীতের চিন্ড়া নেই। ভবিষ্যতের কথাও ভাবি না। চাই বর্তমানে কাজ। আসলে শয়তান মানুষের সময় ও যোগ্যতাকে বিনষ্ট করার জন্যে সদাই মানুষকে এই পাকে ফেলে রাখতে চায়, অমুক এটা করেনি, আমরা এই সুযোগ হাতছাড়া করছি। অতীতে আমাদের কোনো অর্জন নেই। ভবিষ্যতে এটা হওয়া উচিত। আর এইসব ভাবনার ফাঁকে আমাদের বর্তমান হারিয়ে যায়। তোমার জানা থাকবার কথা, কয়েক বছর আগেও যখন আমরা বড় বড় উলামায়ে কেরামের কাছে দাওয়াতের প্রার্থনা নিয়ে কিংবা ছবক শোনানোর উদ্দেশে যেতাম তখন মানুষ আমাদেরকে এমন এমন দলের সদস্য মনে করতো– যেসব দল তাদের দৃষ্টিতে ভ্রান্ড়। কিন্তু আমরা আমাদের পথে চেঁচিয়ে যেতে লাগলাম। কিছু যোগ্য লোক কাজের জন্যে দাঁড়িয়ে গেল। কাজের রিপোর্ট গোচরীভূত হতে লাগলো। সেই সুবাধে আমাদেরও নাম হয়ে গেল। আমাদের সেই চেঁচামেচি অতঃপর কিছুটা নাম ছড়িয়ে পড়ার কারণে এখন বড় বড় আলেম এবং আমাদের মুরব্বিগণ আমাদের তাদের ডানায় বসাতে প্রস্তুত। এই জন্যে প্রতিটি ব্যক্তিরই উচিত, যতটুকু কাজ তার পক্ষে করা সম্ভব তা শুর" করে দেয়া। একটি কবিতা পুরো জাতির কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যে আমি জমিয়তে

ইমাম ওয়ালীউল-াহ-এর বার্ষিক ক্যালেন্ডারে ছেপে দিয়েছিলাম। কবিতাটি ছিল এই–

منزلیں کسی کے گھر حاضری نہیں دیتیں
راستوں پہ چلنے سے راستے نکلتے ہیں

অর্থাৎ, শিকার কভু দেয় না ধরা ঘরে এসে
পথ কি কভু রুদ্ধ থাকে চেষ্টা হলে!

আমি আমার জীবনের টার্গেট নির্ধারণ করার জন্যে একদা এই কবিতাটি মুখস্থ করেছিলাম–

نہیں جن میں تمہارا عکس شامل
وہ نقشے ہیں مٹادینے کے قابل

অর্থাৎ, 'যাতে নেই তোমার সাধনার ছাপ
সেই চিহ্ন হোক চিরনিশ্চিহ্ন'।

আলহামদুলিল-াহ! আল-াহ তায়ালা আমাকে তাঁর নবীর প্রধান সুন্নতটি বুঝতে সাহায্য করেছেন।

প্রশ্ন : অন্যান্য সংগঠন এবং দাওয়াতি কর্মকাণ্ডের সাথে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে আপনার কি মত? এ বিষয়ে কিছু বলুন!

উত্তর : আমি আমার সহকর্মীদের টার্গেট নির্ধারণ করার উদ্দেশে জমিয়তে ইমাম ওয়ালীউল-াহ-এর পরিচিতির সাথে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলাম। নিবন্ধটির শিরোনাম ছিল–

دین کے ہر کام کرنےوالے کے رفیق بنو، فریق نہیں

অর্থাৎ, দীনের সকল কর্মীর বন্ধু হও প্রতিপক্ষ নয়।

আলহামদুলিল-াহ! আমরা এভাবেই চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমরা সকলের সাথে বন্ধু পরিচয়ে কাজ করতে চাই। প্রতিপক্ষ হিসেবে নয়।

প্রশ্ন : তাবলীগ জামাতের সাথে আপনার সম্পর্ক ?

উত্তর : আমি মনে করি, অমুসলিমদের মাঝে এই যে সামান্য ক্ষুদ্রকারে চেষ্টা সাধনা চলছে এটা মূলত তাবলীগ জামাতের মহান মুরব্বি মনীষীদের কর্মকৌশল এবং তাঁদের স্বপ্নেরই ব্যাখ্যা। আমি মনে করি, হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর সাধনা ছিল– আমাদের এই কাজের আলিফ বা আর আমরা এখন যা করছি সেটা হলো, তারই ধারাবাহিক তা ছা। তারপরও তাবলীগি মারকাযের একটা নির্দিষ্ট নিয়ম ও কর্মপন্থা আছে। যতক্ষণ পর্যন্ড় সেখান থেকে অমুসলিমদের মধ্যে দাওয়াতের পরামর্শ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ড় ব্যক্তিগতভাবে এই কাজ করা এবং একে উৎসাহিত করা সঙ্গত মনে করি। আমার একশ' ভাগ বিশ্বাস, বাঙলাওয়ালী মসজিদ থেকে যে আওয়াজ ওঠেছে, পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্ড়ে প্রতিটি মানুষের কাছে ঈমানের বাণী পৌছার আওয়াজ সেটাই। ইনশাআল-াহ! পৃথিবীর সর্বত্র এই মারকায থেকেই এই বাণী পৌঁছে যাবে। এই অধমও সেই বিপ- -বেরই একজন ঝাড়ুদার। এখন যে চেষ্টা-সাধনা করছি, এটাও তাবলীগি প্রচেষ্টারই দান।

প্রশ্ন : দীনি মাদরাসা এবং দীনি শিক্ষার আন্দোলন সম্পর্কে আপনার অভিমত জানতে চাই!

উত্তর : দীনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো মাদরাসা। হযরত রাসূলে কারীম সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-ামকে আল-াহ তায়ালা শিক্ষক করে পাঠিয়েছিলেন। তাবলীগ হলো তালীম শিক্ষারই একটি বিভাগ। আমাদের জন্যে নমুনা হলো– হযরত রাসূলে কারীম সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর মাদরাসা– মাদরাসাতুস সুফফা। এই মাদরাসার শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে ইসলাম ছড়িয়েছে। আলহামদুলিল-াহ! আমরা মাদরাসা এবং মাদরাসার সাথে সম্পৃক্তদের দীনি সেবাকে আমাদের জন্যে সৌভাগ্য মনে করি। মাদরাসার যেন শিক্ষার্থীদের মধ্যে দাওয়াতি মেজাজ গড়ে ওঠে সে জন্যে চেষ্টা করছি। সেই সাথে মাদরাসার বিরুদ্ধে ভুল ধারণা, মন্দ ধারণা, মাদরাসাকে তুচ্ছ করে দেখা এই অধমের দৃষ্টিতে মুসলিম জাতির আত্মহত্যার শামিল।

mv‡ne `v. ev.-Gi AvZ¥Rxebxg~jK mv¶vrKvi

'দীনি শিক্ষার অবদান' শিরোনামে ইন্টারনেটে আমার একটি লেখা রয়েছে। লেখাটি পড়া উচিত। এই অধম বিভিন্ন দীনি মাদরাসায় যায়। অনেকেই দয়া করে আমাকে পরিদর্শন বইয়ে কিছু লিখতে বলেন। তখন আমি অত্যন্ড় গর্বের সাথে নিজের পরিচয়ে একথা লিখি, 'খায়ে পায়ে খুদ্দামে দীন-দীনের সেবকদের পায়ের ধুলি'। এটা কোনো বিনয় থেকে নয়; বরং আমি আশাবাদী, যদি আল-াহ তায়ালার কোনো নেক বান্দার নজর পরিদর্শন বইয়ের এই শব্দের উপর পড়ে আর সেটা যদি হয় কোনো দোয়া কবুলের মুহূর্ত অনন্ড়র আল-াহ তায়ালা যদি এই কথাটুকু কবুল করে নেন, তাহলেই মনে করি আমার জীবন সার্থক। সার্থক আমার পরকাল।

প্রশ্ন : নওমুসলিমদের সংকট ও তা থেকে উত্তরণের পথ সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাই।

উত্তর : আসলে 'খাইরুল কুরুন' তথা ইসলামের প্রশংসিত প্রথম যুগে নওমুসলিম বলতে কোনো পরিভাষা ছিল না। আমার মনে হয়, যে কোনো বিষয় খাইরুল কুরুন থেকে গ্রহণ করার মেজাজ যদি আমরা গড়ে তুলতে পারি তাহলে আমরা অনেক আপদ থেকেই রক্ষা পাবো। আমাদের দাওয়াতি সঙ্গীগণ যখন কোথাও কোনো দাওয়াত বিষয়ক কেন্দ্র গড়ে তুলেন তখন আমরা দারে আরকাম, দারে আবু আইয়ূব ইত্যাদি নাম রাখি। এই অধমের ধারণা, এতে আল-াহ তায়ালার পক্ষ থেকে বরকত হয়। আমি মনে করি, এই নবাগতদেরকে যদি আমরা নওমুসলিম না বলে মুহাজের ভাই বলি, তাহলে অধিক সঙ্গত হয়।

আলহামদুলিল-াহ! আরমোগানের মাধ্যমে দীর্ঘদিন থেকেই এ কথা বলা হচ্ছে। তা ছাড়া কুরআন সুন্নাহ এবং ইতিহাসের আলোকে বার বার এ কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে, কেবল মুসলমানদের জন্যে নয়; বরং পুরো মানব বিশ্বের ব্যক্তি সমাজ রাজনীতি অর্থনীতি সব বিষয়ের সমাধানের একমাত্র পন্থা হলো হযরত রাসূলে কারীম সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর সীরাতের আলোকে দাওয়াত দেয়া। দাওয়াতই

এ সকল সংকট থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ এবং সহজতম পথ। দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে যে সকল সংকটের মুখোমুখি হতে হয় তন্মধ্যে এক্ষেত্রে অভিজ্ঞদের বক্তব্য হলো, সবচে' গুরুত্বপূর্ণ সংকট হলো নওমুসলিমদের সংকট। ইসলাম গ্রহণ করার পর অনেককেই বাড়ি-ঘর ছাড়তে হয়। দয়া করে যাদেরকে আল-াহ তায়ালা হেদায়েত দান করেছেন সেই ভাগ্যবানদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সংকটগুলোর মুখোমুখি হতে হয় দাওয়াতকর্মীদের। এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্যে তাদেরকে জামাতে পাঠানো হচ্ছে। মাদরাসায় থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাদের প্রশিক্ষণের জন্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এক কথায় এক্ষেত্রে চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তারপরও দৃশ্যত যা বুঝা যাচ্ছে, এর হক আদায় করা তো দূরের কথা, প্রয়োজনের এক দশমাংশও পূরণ হচ্ছে না।

সারা পৃথিবীর দা'য়ীগণের অভিজ্ঞতা হলো– নওমুসলিমদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি যদি অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে খাপ খাইয়ে নেয়ার চেষ্টা করা হতো এবং যদি তাদের কাছে এমন কোনো ব্যবস্থা হতো, যাতে করে তারা পরিবার, আত্মীয়-স্বজন এবং আপনজনদেরকে নিজেদের ঘরে কয়েক দিনের জন্যে অতিথি হিসেবে রাখতে পারে, তাহলে হয়তো ধীরে ধীরে খুব সহজেই তার পরিবার ভাইবোন মা-বাবা এবং বন্ধু-বান্ধবরা মুসলমান হয়ে যেতো। এর বিপরীতে এই নওমুসলিমগণ যদি ইসলাম গ্রহণ করার পর দ্বারে দ্বারে ফিরতে হয়, প্রয়োজনের তাগিদে মানুষের কাছে হাত পাততে হয় তাহলে তারা অন্যদেরকে আর কি দীনের দাওয়াত দেবে! বরং অন্যদের ইসলাম গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। আমরা আমাদের ঘরে বসে থেকে একজন মুহাজের নওমুসলিম ভাইয়ের ব্যথা উপলব্ধি করতে পারবো না।

মানুষ একটি সামাজিক জীব। জীবনের প্রতিটি আত্মীয়তা এবং বন্ধনই তার জন্যে অপরিহার্য। আমরা যদি আমাদের কোনো একটি আত্মীয়তার দিককে শূন্য কল্পনা করি তাহলেই তার সংকীর্ণতা মনের ভেতর অনুভব করতে পারবো। যেমন : বড় বোন আছে কিন্তু ছোট বোন নেই। খালা আছে তো ফুফু নেই। আত্মীয়তার কোনো একটি শাখা নাই হয়ে গেলে

আমাদের দীর্ঘশ্বাস চেপে রাখতে পারি না। যখন একজন নওমুসলিম সব কিছু ছেড়ে মর“ বিয়াবানে এসে ওঠে তখন তার মন জয় করা, তাকে সান্ড়্বনা দেয়া কতটা প্রয়োজন তা আমরা এখান থেকেই উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু যারা ঘরে পরিবার-পরিজনের সাথে আজন্ম সুখের জীবনযাপন করছে তাদের পক্ষে এই বেদনা উপলব্ধি করা কখনও সম্ভব নয়। আমরা এই নওমুসলিমদের জন্যে কী করি? খুব বেশি হলে শুর“র দিকে কিছু পয়সা ভিক্ষে দিই। অনেক সময় দেখা যায়, প্রথমবার যখন কোনো নওমুসলিমকে তার প্রয়োজন সারার জন্যে কিছু পয়সা দেয়া হয়, তখন তার চোখ পানিতে ঝাপসা হয়ে ওঠে। ভাবে, মানুষ আমাকে অভাবী মনে করছে। অথচ এই ব্যক্তিটিকেই পরে প্রয়োজনের তাড়ায় অন্যের কাছে বাধ্য হয়ে হাত পাততে হয়। ক্রমাগত তার সেই অনুভূতিশীল অন্ড়র প্রয়োজনের নীচে চাপা পড়ে যায়। ভিখেরির মতো মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়ায়। জীবন সংকটের পাকে পড়ে তারা দীনি শিক্ষাদীক্ষা থেকেও বঞ্চিত থাকে। কখনও বা জামাতে উপযুক্ত আমীর না পাওয়ার কারণে নানা বিপদে মুখোমুখি হতে হয়।

আমরা যদি হযরত রাসূলে কারীম সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর সীরাতের আলোকে তাদের এই মানবিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকটের সুরাহা খুঁজি, তাহলে দেখি, এর পরিপূর্ণ এবং সহজতম সমাধান হলো আমাদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধন। বর্তমানকালে আমাদের মুসলিম সমাজে এ এক উপেক্ষিত সুন্নত। অথচ নওমুসলিমদের সংকট সমাধানের এটা ছিল স্থায়ী পরিপূর্ণ এবং সহজ সমাধান।

কোনো একটি আন্ড়র্জাতিক সংগঠনের কাছে যদি এক সাথে পাঁচশ' মুহাজির অতর্কিতভাবে এসে উপস্থিত হয় তাহলে দেখা যাবে অনেক বড় দাতা বরং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও এই সংগঠন তাদের গঠন বিয়ে-শাদী এবং আয়-রোজগারের সমাধান দিতে পারবে না। এর বিপরীতে আমরা যদি হযরত রাসূলে কারীম সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর হারানো সুন্নত, ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের আলোকে এই সমস্যার সুরাহা করতে চাই, তাহলে কেবল এক ভারতেই যদি এক কোটি মুহাজির আমাদের কাছে

ঘর-বাড়ি ছেড়ে এসে উপস্থিত হয়, আর এক কোটি মুসলমান যদি তাদেরকে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের টানে বুকে তুলে নেয়, মুহূর্তে এক কোটি মানুষের সব সমস্যা মিটে যেতে পারে। একজন মুসলমান আগত একজন মুসলমানকে নিজের ভাই কিংবা পুত্র হিসেবে তার দেখা-শোনা, তার বিয়ে-শাদী এমনকি আয়-রোজগারের সুরাহা করাও কোনো ব্যাপার নয়। যার চারজন পুত্র সন্ড়ান রয়েছে, সে যদি আর একজন নওমুসলিমকে পুত্র হিসেবে বরণ করে নেয় এবং চারের জায়গায় পাঁচজনকে লালন-পালন দেখা-শোনা এবং বিয়ে-শাদীর ব্যবস্থা করে তাহলে এটা কোনো বড় বোঝা নয়। যদি এভাবে এক কোটি নওমুসলিমকে দুই বছর পুরনো মুসলমানগণ তাদের বুকের মধ্যে ধরে রাখতে পারে তাহলে এই নবাগতরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যাবে। অন্ড়ত তারাই তাদের পরিবার-পরিজনের হেদায়েতের পথ উন্মোচিত করতে যথেষ্ট হবে। দেখা যাবে, এই এক কোটি কয়েক বছরে কয়েক কোটির ভ্রাতৃত্ব গ্রহণের জন্যে বুক পেতে দাঁড়িয়ে গেছে। একটি গুর“ত্বপূর্ণ কথা হলো– আপনি যতই যত্নবান হোন না কেন, একজন নওমুসলিমের হয়তো এক দুই সপ্তাহ খবর রাখবেন। অথচ তাদের কিছু সংকট এমনও থাকে যা প্রতিটি মুহূর্তে লক্ষ রাখার মতো। কেউ কেউ কখনও কখনও প্রতিটি মুহূর্তেই আশ্রয়ের মুখাপেক্ষি থাকে। আপনি যদি তাকে আপনার ঘরের সদস্য করে নেন, তাহলে সে সর্বদা আপনার ঘরে উপস্থিত থাকবে। আমাদের নবীর জীবনে এ বিষয়ে আমাদের জন্যে চমৎকার নির্দেশনা রয়েছে। একদিকে তো মানুষের বংশ পরিচয় পরিবর্তনকে চরম ঘৃণার দৃষ্টিতে নিন্দা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা তাদের বংশ-পরিচয় বদলে ফেলে তারা বেহেশতের সুবাস থেকেও বঞ্চিত হবে। অথচ কেউ যদি ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে কাউকে নিজের বংশের অন্ড়র্ভুক্ত করে নেয় তাহলে আমাদের ফকীহগণ বলেছেন, এই নবাগত আশ্রয়দানকারীর বংশ-পরিচয়ে পরিচিত হতে পারবে। ইমামুল মুহাদ্দিসীন ইমাম বুখারী (রহ.)-এর বংশগত পরিচয় হলো– জুফী ইয়ামানী। তাঁর পরদাদা মুগীরা মুসলমান হয়ে যাঁর ভ্রাতৃত্বে ছিলেন এটা মূলত তাঁর বংশপরিচয়। অভিজ্ঞতা সাক্ষী- বংশগত কোনো মুসলমান পরিবার যদি ইসলামী ভ্রাতৃত্বের টানে কোনো মুহাজিরকে বরণ করে নেয়, আর এই

নবাগত যদি দীনদার নাও হয়; তবুও ক্রমাগত এই সুন্নতের বরকতে দীনদার হয়ে ওঠে। আমাদের কাছে এমন উপমা অসংখ্য।

এই কয়েকদিন আগের কথা। উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলের একটি জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিখ্যাত শহরের নিকটস্থ একটি গ্রামে একজন ছেলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারপর সে গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে এসেছে। পরিবারের লোকেরা তাকে চাপ দিয়েছে। যারা আশ্রয় দিয়েছে তাদের বির"দ্ধে তাদের ক্রোধ ও ক্ষোভের প্রকাশ ঘটিয়েছে। এলাকার লোকেরা মুসলমানদের উপর হামলা করার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সেখানকার মুসলমানদের পক্ষ থেকে আমাদের কাছে ফোন এসেছে। আমি তাদেরকে বলেছি, আল-াহ তায়ালা ওয়াদা করেছেন, 'আল-াহই তোমাকে মানুষের হাত থেকে রক্ষা করবেন'। সুতরাং তোমরা মোটেও চিন্ড়া করবে না। ইনশাআল-াহ 'কাফা বিল-াহি হাসিবা'। আল-াহই যথেষ্ট। তোমাদের কিছুই হবে না।

দেখা গেল, কয়েকজন লিডার মাঝখানে এসে বিষয়টি তাদের হাতে নিয়ে নিল। তারা ছেলেটিকে ডেকে পাঠালো। যখন দেখলো, ছেলেটি মরতে রাজি কিন্তু কুফরীতে ফিরে যেতে রাজি নয়; তখন তারা রাগে ক্ষোভে ছেলেটিকে রেখে চলে গেলো। সেখানকারই একজন মুসলমান লিডার ব্যক্তিগতভাবে চরম ধর্মনিরপেক্ষ। ধর্মের সাথে তো নেই-ই; বরং কিছুটা ঘৃণা রয়েছে। সামাজিকতার কারণে হয়তো ঈদের নামায পড়ে। দেখা গেল, এই বিষয়টির প্রতি তার বেশ আগ্রহ। অত্যন্ড় গুর"ত্বের সাথে সে বিষয়টির সাথে সংশি-ষ্ট থেকেছে। আমি তাকে খবর দিলাম। আসার পর বললাম, আপনার ছেলে কয়জন। তিনি বললেন-চার জন। আমি বললাম, চারজন তো খুবই কম। এই পঞ্চম ছেলেটিও আপনার। এই নওমুসলিম ছেলেটি সবকিছু ছেড়ে ছুঁড়ে এসেছে। তাকে আশ্রয় দেবে কে? তার আবেগ জ্বলে উঠলো। বললো, এটা আমার পঞ্চম ছেলে নয়; এটাই আমার প্রথম ছেলে। বাকি চারজন পরে। আলহামদুলিল-াহ! তারপর তিনি ছেলেটিকে মাদরাসায় ভর্তি করে দেন। ছেলেটি হাফেজ হওয়ার পর এখন আলেম হওয়ার কাছাকাছি। দেখা গেছে, এখন সেই

ধর্মনিরপেক্ষ লিডারের অবস্থা হলো, সপরিবারে হজ্ব করে এসেছে। শুধু তার মুখেই নয়; ছেলেদের মুখেও দাড়ি। ঘরের নারী-পুর"ষ সকলেই নামায পড়ছে। কিছুটা তাহাজ্জুদও পড়ছে। এই ধরনের ঘটনা অসংখ্য আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যে কথা বলছিলাম, একটি পরিবার যদি একজন ব্যক্তিকে তাদের ঘরের প্রকৃত সদস্য করে নেয়, তারপর তার শিক্ষাদীক্ষা বিয়ে-শাদী এবং আয়-উপার্জনের তত্ত্বাবধান করে তাহলে এটা কোনো কঠিন বিষয় নয়। এখন সবচে' বড় প্রয়োজন হলো– মুসলমানদের মধ্যে এই চেতনা জাগিয়ে তোলা। এখন তো সময়টা এমন, আল-াহ তায়ালা আসমান থেকে হেদায়েত পাঠিয়ে দিয়েছেন। স্বেচ্ছায় যারা মুসলমান হচ্ছে তাদের সংখ্যা অসামান্য। সেই সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছেই। ইসলামের বির"দ্ধে যতই অপপ্রচার চলছে ততই মানুষের মধ্যে ইসলামকে জানবার আবেগ ও আকুতি তরঙ্গায়িত হচ্ছে। ইসলামকে জানবার চেতনা ইসলামের পথকে উন্মোচিত করে দিয়েছে। আজ প্রয়োজন এই চেতনাকে যথাযথভাবে কাজে লাগাবার জন্যে ইসলামের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের সুন্নতকে পুনর"জ্জীবিত করা। যদিও নওমুসলিমদের সংকটকে খুব কঠিন করে দেখা হচ্ছে। আমরা মনে করি, যদি আমাদের নবীর সীরাতের আলোকে এর সমাধান চিন্ড়া করা হয়, তাহলে এটা মোটেও কোনো কঠিন সংকট নয়।

প্রশ্ন : আপনি 'আপকি আমানত' পুস্ড়িকাটি কিভাবে লিখেছেন? কী কারণে পুস্ড়িকাটি এতটা গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : আসলে এর মূল শক্তি হলো, আমার হযরত (রহ.) ও তাঁর মায়ের দোয়া। কিছু মুখলেস বন্ধুর পক্ষ থেকে আবেদন ছিল, আমরা যখন দাওয়াত দিতে যাই, তখন অনেক সময় মনের মধ্যে বাধা অনুভব করি। কিভাবে কথা শুর" করবো, কোন কথাকে বেশি গুর"ত্ব দেবো- এসব বিষয়ে একটি ক্ষুদ্র পুস্ড়িকা লিখে দিন। সম্ভবত শুভাকাঙ্খীদের হুকুম তামিলের বরকতেই এই কিতাব আজ এই অসামান্য গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। নইলে এর মধ্যে তো কিছুই নেই। অথচ এ পর্যন্ড় এই কিতাব

পাঠ করে কেউই প্রভাবিত না হয়ে থাকতে পারেনি। আমাদের ভারতের প্রায় সব ভাষাতেই এর অনুবাদ হয়েছে।

প্রশ্ন : অন্যান্য দেশে দাওয়াতকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে আপনি কিছু করছেন কি?

উত্তর : আসলে আমরা কেউ যে কিছু করতে পারি! আমরা তো আসমান থেকে নেমে আসা হেদায়েতকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে নিজেদের মতলব সিদ্ধ করছি। তিন বার হারামাইন শরীফাইনের সফর করেছি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগতদের মধ্যে এই চেতনা জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করেছি। আলহামদুলিল-াহ! বিভিন্ন দেশে কাজ সম্প্রসারিত হচ্ছে। দাওয়াতি মানসিকতা গঠনের উদ্দেশে আরবিতে 'আল খায়ের' প্রকাশিত হচ্ছে। এজন্যে ইংরেজিতেও চেষ্টা চলছে। মানুষ প্রতিদিনই প্রস্তুত হচ্ছে। বিশেষ করে আরমোগানের ধ্বনি তো এ পর্যন্ড় পৃথিবীর অনেক প্রান্ড়কে স্পর্শ করেছে।

প্রশ্ন : যারা দাওয়াতের কাজ করছে সকলের কর্ম-পদ্ধতি এক নয়। এ সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাই।

উত্তর : আমাদের হযরত তাঁর বক্তৃতা এবং রচনায় বার বার এ কথা বলেছেন, দাওয়াতের বিষয়টি কুরআন এবং হাদীস দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত। কিন্তু তার পদ্ধতি কি হবে কুরআন-হাদীসে বলা নেই। দাওয়াতের পদ্ধতি দা'য়ীর অন্ড়রে প্রতিনিয়ত উদিত হয়। এই অধমের ধারণা হলো, একজন দা'য়ীর মাধ্যমে যখন আল-াহ তায়ালা হাজার হাজার মানুষকে হেদায়েত দান করেন তখন দেখা যায়, এই দা'য়ী প্রতিটি ব্যক্তির সাথে একই স্টাইলে একই ভাষায় কথা বলেনি। এখন মানুষ বিভিন্ন আঙ্গিকে কাজ করছে। যে যে পদ্ধতিতে কাজ করছে সেই পদ্ধতি তার কাছে স্পষ্ট এবং উপযুক্ত। তাছাড়া কাজ করতে গিয়ে অভিজ্ঞতায় দাওয়াতের মূল মর্মও তার আয়ত্বে এসেছে। সুতরাং বৈধ যে কোনো পদ্ধতিতে দাওয়াতের কাজ করা যেতে পারে। এতে কারও কিছু বলবার

নেই।

প্রশ্ন : অন্য ধর্মের গ্রন্থাবলীর রেফারেন্সে দাওয়াত দেয়াটা কেমন?

উত্তর : এ সম্পর্কে কুরআনে কারীমেই স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। আল-াহ তায়ালা হযরত রাসূলে কারীম সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-ামকে সম্বোধন করে বলেছেন–

قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلٰي كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهُ

অর্থ : 'হে আহলে কিতাব! তোমরা এমন একটি বিষয়ের প্রতি এগিয়ে আসো যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে এক ও অভিন্ন। আর তা হলো আমরা আল-াহ ছাড়া আর কারও এবাদত করবো না'। (আলে ইমরান: ৬৪)

হযরত থানভী (রহ.) বলেছেন, যতটুকু ইসলাম আহলে কিতাবের গ্রন্থাবলীতে আছে, তারা যদি ততটুকু মেনে নেয় তাহলেই তারা নাজাত পেয়ে যাবে। তবে দাওয়াতের এই পদ্ধতির জন্যে দা'য়ীকে দক্ষ আলেম হতে হবে। তার যোগ্যতা এবং পড়াশোনা হতে হবে গভীর এবং ব্যাপক। অন্যথায় এক ধর্মের জায়গায় বহু ধর্মের ঐক্য এসে ঠাঁই নেবে। অনেকবার অনেককে বলতে শুনেছি, এই ব্যক্তি তো আমাদের ধর্মেই চলে আসবে দেখি! আসল কথা হলো, মানুষকে কাছে টানবার জন্যে তাদের পরিভাষা দিয়ে কথা শুর“ করা যায়। এটা মানুষের একটা স্বভাবজাত বিষয়। চেনা এবং পরিচিত বিষয়ের প্রতি মানুষ এমনিতেই দুর্বল থাকে। তবে এজন্যে শিরক কিংবা শিরকি কোনো রেওয়াজের মধ্যে দা'য়ী ঢুকে যেতে পারবে না। যত্নের সাথে লক্ষ রাখতে হবে, একজনকে দাওয়াত দিতে গিয়ে তাকে খুশি করার জন্যে এমন কিছু করা যাবে না, যা আল-াহ তায়ালার ক্ষোভ ও অসন্তুষ্টিকে ডেকে আনে।

প্রশ্ন : আজকাল ইসলামকে পরিচয় করানোর জন্যে অনেকেই কুরআন মাজীদ পবিত্র সীরাত ইত্যাদি বিষয়ে রচনা লিখিয়ে এবং কুইজ

mv‡ne `v. ev.-Gi AvZ¥Rxebxg~jK mv¶vrKvi

প্রতিযোগীতার মাধ্যমে দাওয়াতের কাজ করছে। এটাকে আপনি কিভাবে দেখেন?

উত্তর : এটাও একটি উপযুক্ত এবং মুবারক পন্থা। কোনো সন্দেহ নেই, ইসলাম এবং ইসলামের নবী সম্পর্কে মানুষের মধ্যে নানা ভুল ধারণা রয়েছে। পৃথিবীব্যাপী ইসলামের যে বিরোধিতা হচ্ছে এর প্রধান কারণই হলো– ইসলাম সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণা। সুতরাং এটা একটা ভালো পদ্ধতি। এর প্রয়োজন আছে। আমি মনে করি, প্রচার মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে আরও বড় আকারে কাজ করা উচিত। যারা কাজ করছে তাদের সাহায্য এবং সেবা করা উচিত। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের যোগ্যতা এবং সামর্থ্য মাফিক কাজ করবে। এমনিতে প্রতিটি মানুষই তার শক্তি অনুযায়ী ব্যবসা-বাণিজ্য করে। আমরা ছোট পুঁজির কাঙাল ধরনের ব্যবসায়ী। যারা ক্ষুদ্র পুঁজিতে বাণিজ্য করে তারা অল্প পরিশ্রমে অনেক মুনাফা করতে চায়। আমাদের ধারণা হলো, যারা ইসলাম প্রচারের জন্যে এভাবে বড় বড় পুঁজি বিনিয়োগ করছেন তাদের চিন্ড়া হলো– অনেক সময় ও সাধনার পর যদি কিছু লোকও ইসলামে চলে আসে তাহলে সেটা কম কোথায়? তবে ইসলামকে পরিচিত করানোটাই শেষ কথা নয়। আমাদেরকে কেবল ইসলামকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়নি। দাওয়াত দেয়াটাও আমাদের কর্তব্য। পরিচয় এক জিনিস, দাওয়াত আরেক জিনিস। যাই হোক, এটা এই অধমের ধারণা।

প্রশ্ন : প্রচার মাধ্যম, যেমন : টিভি, ইন্টারনেট ইত্যাদি দাওয়াতের কাজে ব্যবহার করাটা কেমন? বর্তমানে ডাক্তার জাকির নায়েক পিচ টিভির মাধ্যমে যে কাজ করছেন এ সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

উত্তর : আমি প্রচার মাধ্যমগুলোকে তাবলীগেরই মাধ্যম মনে করি। মনে করি, পৃথিবীর প্রতিটি কাঁচাপাকা ঘরে ইসলাম পৌঁছে দেয়ার জন্যে এই প্রচার মাধ্যমগুলো আল-াহ তায়ালার পক্ষ থেকেই একটি ব্যবস্থা। এগুলো ব্যবহার করার মতো সুযোগ যাদের আছে তাদের উচিত এ সুযোগকে কাজে লাগানো। ডাক্তার জাকির নায়েক এবং তার পদ্ধতিতে

যারা দাওয়াতের কাজ করছেন আমি তাদেরকে মর্যাদার সাথেই দেখি। তবে আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী আলেমদের কথা হলো– ডাক্তার জাকির নায়েক ও তাদের মতো দা'য়ীদের কাজ হলো কেবল দাওয়াতের মধ্যেই নিজেদেরকে নিমগ্ন ও সীমাবদ্ধ রাখা। মসলক ও ফিকহী গবেষণা থেকে বিরত থাকাটাই তাদের জন্যে সঙ্গত। অধম এ বিষয়ে তাদের সাথে একমত। আমি স্বীকার করছি, ডাক্তার জাকির নায়েকের দ্বারা কোনো ফায়দা হচ্ছে না, এমনটা বলা সঙ্গত নয়। আমি বিভিন্ন জায়গায় এমন অনেক অমুসলিমকে পেয়েছি যারা পিচ টিভি দেখে প্রভাবিত হয়েছে। তারপর ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করতে শুর“ করেছে। তাদের কেউ কেউ অন্য কোনো মাধ্যমে গিয়ে মুসলমান হয়েছে। সুতরাং বৈধতার ভেতরে থেকে প্রচার মাধ্যমকে ব্যবহার করাটাকে আমি সমর্থন করি। বিশেষ করে আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে ইসলাম সম্পর্কে প্রচারিত যেসব ভুল ধারণা রয়েছে, যেমন– ইসলাম তলোয়ারের মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছে, ইসলামে বহু বিবাহ ইত্যাদি এসব প্রচার মাধ্যমকেই কাজে লাগিয়ে দূর করা সম্ভব। যারা এক্ষেত্রে কাজ করছেন তাদের কাজের ইতিবাচক ফলাফলকে মূল্য দেয়া উচিত। যদি সেখানে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো মন্দ দিক প্রমাণিত হয় তখন সেটা আন্ড়রিকতার সাথে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দূর করতে চেষ্টা করা উচিত।

প্রশ্ন : দাওয়াতের জন্যে কোনো পদ্ধতিটিকে আপনি সবচে' সফল মনে করেন?

উত্তর : আমরা মনে করি কুরআনের মাধ্যমে দাওয়াত দানের যে পদ্ধতি, আমাদের প্রশিক্ষণ কর্মশালাগুলোতে শেখানো হচ্ছে এটাই সবচাইতে সহজ এবং সতর্কতামূলক। আমরা খুবই দুর্বল। যারা দুর্বল তাদেরকে সব সময় সতর্ক এবং সহজ পথ বেছে নিতে হয়। কুরআনের মাধ্যমে দাওয়াত দেয়ার জন্যে যেমন অনেক যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না, তেমনি অনেক তর্ক-বিতর্কেরও প্রয়োজন পড়ে না। ফলে অল্প পুঁজিতে লাভ হয় অনেক। দশ মিনিটের আলোচনা শেষে কালেমা পেশ করা যায়। মানুষ আনন্দ চিত্তে কালেমা গ্রহণও করে নেয়। অল্প পুঁজিতে যদি অনেক লাভ

করা যায় তাহলে অন্য পন্থায় যাওয়ার প্রয়োজন কি? কুরআনে কারীমের এই অলৌকিকতা এখন আমরা আমাদের চোখে দেখবার সুযোগ পাচ্ছি। অনেক সময় দেখা যায়, কুরআন বুঝে না এমন ব্যক্তির সামনে যখন আরবিতে কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করে শোনানো হয়, তখন সে কাঁদতে শুর ্করে। অন্য নবীগণের কাজ তো তাদের জীবনেই শেষ হয়ে গেছে। শেষ হয়ে গেছে তাদের মুজেযার কারিশমাও। আমরা মনে করি, এই পদ্ধতি সুন্নতেরও অধিক কাছাকাছি। আমাদের নবী সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর দাওয়াত পদ্ধতি নিয়ে যদি আমরা ভাবি, তাহলে দেখবো, তিনি তাঁর দাওয়াতি আলোচনায় সংক্ষেপে এইটুকু বলে দিচ্ছেন-

قُـوْلُـوْا لَا اِلٰـهَ اِلَّااللهُ تُـفْـلِـحُـوْنَ

অর্থ : 'লা ইলাহা ইল-াল-াহ বলো, সফলকাম হবে'।

লিখিত দাওয়াতে সংক্ষেপে এইটুকু লিখে দিতেন–

اَسْلِمْ تَسْلَمْ

অর্থ : মুসলমান হয়ে যাও, নিরাপত্তা পেয়ে যাবে।

ফলে এটাকে আমরা সবচে' সহজ পন্থা মনে করি। আর সহজ হওয়ার কারণেই আমাদের মন এদিকেই টানে।

প্রশ্ন : অনেকেই প্রশ্ন করে শুধু কালেমা পড়িলে কী লাভ?

উত্তর : একথা আমি প্রায় সবজায়গায়ই বলি। লৌকিকতা নয়, বরং এটাই সত্য। এই অধম তো দাওয়াতের অ-আ-ও জানে না। বিভিন্ন জায়গায় দাওয়াতের প্রশিক্ষণ মূলক কর্মশালা চলছে। কিন্ড়ু এই অধম যে সেখানে উপস্থিত হয়ে কিছু শিখবে সেই সুযোগও পাচ্ছে না। অনেকবার তো এমন হয়েছে, অনর্থক খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার কারণে মানুষ আমার সাথে এসে দেখা করে। তখন আমি আপনাদের মতো প্রশিক্ষিত দা'য়ীদেরকে খুঁজি। যখন খুঁজে ব্যর্থ হয়, তখন বাধ্য হয়েই আমাকে কথা বলতে হয়। কথা হলো, যখন আমি কিছু জানি না তখন 'কালেমা পড়'– এটা ছাড়া আর কি-ই-বা করতে পারি! একটি হাসির কথা বলি। একবার এক খান

সাহেব এক সরদারজীকে শুইয়ে দিয়ে তার বুকের উপর ওঠে বসেছে। তারপর ধমক দিয়ে বলেছে, কালেমা পড়। সরদারজী জীবনের ভয়ে তখন বললো, পড়িয়ে দাও। খান সাহেব তখন বললো, আমারও তো মনে নেই। আসল কথা হলো কি, আমরা এর চেয়ে বেশি কিছু পারি না। এ কারণেই রীতি মতো দলিল-প্রমাণসহ কাউকে দাওয়াতও দিতে পারি না। ফলে এই দুর্বলতার কারণেই হযরত রাসূলে কারীম সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর বাণী–

'কূলূ লা ইলাহা ইল-াল-াহ তুফলিহূন'- এর সাথে একটা বিশেষ ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠেছে। এখন এর মধ্যেই মজা পাই। তাছাড়া এই 'কালেমা পড়'- এর দ্বারা অনেক লোকের জীবন এতটাই ঈর্ষণীয়ভাবে বদলে গেছে যা কল্পনারও অতীত। সুতরাং এমন উপকারি পন্থা আমরা কেন লুফে নেবো না? এটাও ঠিক, শুধু কালিমা পড়িয়ে ছেড়া দেয়া কোনোভাবেই ঠিক নয়। তবে সবকিছু বুঝাবার পর কালিমা না পড়াতে পারা এটাও ঠিক নয়। কালিমা ছাড়া তো কোনো কিছুই হয় না। অনেককেই দেখা গেছে, জীবনভর এক ব্যক্তির পেছনে সাধনা করে যাচ্ছে। তাকে অনেক বই পড়িয়েছে। দলিল-প্রমাণের আলোকে বুঝিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ড় কালিমা পড়ানোর সুযোগ হয়নি। এর দ্বারা কী লাভ?

আমাদের এই ভারতবর্ষে, যেখানে আমাদের স্বদেশী এবং অমুসলিম ভাইদের অধিকাংশই হলো হিন্দু– তাদের অধিকাংশই রেওয়াজী হিন্দু। তাদের মধ্যে জেনে বুঝে হিন্দুর সংখ্যা প্রায় শূন্যের কোঠায়। আমাদের একজন অনেক বড় হিন্দু ধর্মের নেতা এবং সনদ হিসেবে বিবেচিত স্কলার বলেছেন– আমাদের এ দেশে হাজার হাজার হিন্দুর মধ্যে হয়তো একজন এমন পাওয়া যাবে যে বেদ গ্রন্থ দর্শন করেছে। অথচ এটা তাদের ধর্মের কেন্দ্রীয় গ্রন্থ। লাখ লাখ হিন্দুর মধ্যে হয়তো এমন একজন পাওয়া যাবে যে বেদের পাঠক। তার বক্তব্য হলো, পুরো ভারতে একশ' কোটি হিন্দুর মধ্যে হয়তো একশ'জনও এমন নেই যারা বেদসমূহকে বুঝে। সে হিসেবে বলতে পারি, প্রতি এক কোটি হিন্দুর মধ্যে একজন ছাড়া বাকি সবাই

রেওয়াজী হিন্দু। তারা তাদের ধর্ম সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ।

এতে একথাই প্রমাণিত হয়, এখানে দাওয়াতের কাজ করার জন্যে খুব বেশি পড়াশোনার প্রয়াজন নেই। এখন প্রয়োজন কেবল সাহসের। তবে এখানকার মানুষ যেহেতু ভালোবাসাপ্রবণ, তাই সাহসের সাথে চাই ভালোবাসা। এখানে প্রয়োজন এমন দা'য়ীর যারা সাহস করে মমতার সাথে বলবে– কালিমা পড়ো। এমন অনেককেই আমরা জানি, যারা তাদের অভীষ্ট ব্যক্তিদের পেছনে ইসলামকে পরিচিত করে তোলা এবং ভুল ধারণা দূর করার পেছনে বছরের পর বছর মেহনত করে যাচ্ছেন। কিন্তু কালিমা পড়ানোর সুযোগ হচ্ছে না । যখন জিজ্ঞেস করা হয়- আপনি কি কালেমা পেশ করছেন? তখন তারা বলে, সাহস হয়নি। এটা একেবারে সত্য কালিমা পড়তে বলার জন্যে কালিমা পড়, এর একটি সাহস চাই। এটা সাহসেরই ফসল।

ত্রৈমাসিক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী আলেমগণের উদ্দেশ্যে এই অধম একথাই বলছিল। কেউ তো বলতে পারে না মানুষের জীবনের একটি মিনিটেরও ভরসা আছে কি না! কোন শ্বাস জীবনের শেষ শ্বাস তা তো কারই জানা নেই। মৃত্যুর পর তো অনন্ড়কালের ব্যর্থতা অথবা সফলতা বেহেশ্ত অথবা দোযখ। যদি পরকালীন বেহেশ্ত-দোযখের প্রতি বিশ্বাস থাকে এবং কালেমার উপরই যে মুক্তি নির্ভরশীল এ বিষয়ে যদি আস্থা থাকে তাহলে দীর্ঘ আলোচনা এবং দলিল-প্রমাণের সুযোগ কোথায়? এক ব্যক্তি কূপে কিংবা নদীতে ডুবে যাচ্ছে, অগ্নিগর্ভে ঝাঁপিয়ে পড়ছে– এখানে একজন মানুষের দায়িত্বটা কি! এখানে যৌক্তিকভাবে কি এর কোনো অবকাশ আছে– এই পতন্মুখ ব্যক্তিকে কি এই বলে দীর্ঘ ভাষণ দেয়ার সুযোগ আছে- 'জনাব! এই নদী খুবই গভীর। আপনি যখন এতে পতিত হবেন তখন বুঝতে পারবেন, আপনি সাঁতরাতে পারেন না। আপনি নীচে চলে যাবেন। তারপর পানি আপনাকে আবার উপরের দিকে ঠেলে দেবে। তারপর আবার পানির ভেতরে চলে যাবেন। তারপর আপনার মুখের ভেতর পানি চলে যাবে। শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। ফুসফুসে বাতাসের জায়গা দখল করে নিবে পানি। তারপর আপনার শ্বাসরূদ্ধ হবার উপক্রম

হবে। চক্ষুদয় বেরিয়ে পড়ার অবস্থা হবে। অক্সিজেন না পাওয়ার কারণে রক্ত জমে যেতে শুরু করবে। তারপর আপনার জিহ্বা বেরিয়ে আসবে। এরপর আপনি ডুবে যাবেন এবং মরে যাবেন। হতে পারে আপনার লাশও কেউ খুঁজে পাবে না। আপনাকে খুঁজে খুঁজে আপনার পরিবারের জীবন হয়তো দোযখে পরিণত হবে। সুতরাং আমার মত হলো– আপনি আপনার ডুবে মরার ইচ্ছাকে পরিহার করুন। এমন ভয়াবহ ক্ষেত্রে ভাষাসাহিত্যে টান টান দলিল-প্রমাণসমৃদ্ধ আলোচনা জুড়ে দেবে, না পানিতে ডুবতে উদ্যত ব্যক্তিকে রক্ষা করার জন্যে নিজে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে হাত-পা ধরে টেনে তুলে আনবার চেষ্টা করবে। এই পৃথিবীতে কত বীর সাঁতারু ডুবন্ড়দেরকে বাঁচানোর জন্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন! তাদের কখনোও দীর্ঘ ভাষণের সুযোগ হয়নি। তাছাড়া এখানে দীর্ঘ ভাষণ কোনো যুক্তিসমর্থিত বিষয়ও নয়।

এক ব্যক্তি আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তাকে দেখে কি কেউ এই বলে ভাষণ জুড়ে দেবে, 'জনাব! আপনার জানা নেই এটা কত ভয়াবহ আগুন। আপনি এর ভেতর পতিত হওয়ামাত্র আগুন আপনার কাপড়ে এসে লাগবে। কাপড় স্পর্শ করার সাথে আপনার শরীরের পশমগুলো জ্বলে যাবে। প্রথমে আগুন আপনার শরীরের চামড়াকে ধরবে। চামড়া পুড়ে যাবে। তারপর আগুন ধরবে আপনার শরীরের মাংশে। আপনার পরিবারের লোকেরা যদি তখন আগুন নিভিয়েও ফেলে, আপনি যদি তখন বেঁচেও যান তাহলেও আপনাকে যখন হাসপাতালে নেয়া হবে তখন হাসপাতালে বিছানায় শুয়াও কঠিন হয়ে পড়বে। যন্ত্রণা আপনাকে অস্থির করে রাখবে। পোড়া মাংসে পচন ধরবে। দুর্গন্ধ এবং পুঁজের সৃষ্টি হবে। যারা দেখতে আসবে তারাও ভয়ে আতঙ্কিত হবে। আপনি যদি মারা যান তখন আপনার দাফন কাফনও কঠিন হবে। এভাবে দীর্ঘ ভাষণ দিবে না। তাকে রক্ষা করার জন্যে নিজের জীবনকে আশঙ্কায় ফেলে দিয়ে হলেও তাকে আগুন থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে।

নদীতে পড়ে ডুবন্ড়কে রক্ষা কিংবা আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে জ্বলন্ড়কে উদ্ধার করতে যতটুকু সময় আছে একজন মানুষের মৃত্যুর তো ততটুকু

সময়ও নেই। সুতরাং ‘মুসলমান হও, নিরাপদ হয়ে যাবে’ কিংবা ‘হে লোক সকল! বলো, আল-াহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই সফলকাম হয়ে যাবে’। বলা ছাড়া একজন দা‘য়ীর সামনে আর কী উপায় আছে? আমাদের সত্য নবী হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম কত সুন্দর ও সত্য কথা বলেছেন, তোমরা পতঙ্গের মতো আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ছো আর আমি তোমাদের কোমর ধরে ধরে বের করে আনছি। এ কারণেই তো তাঁকে লক্ষ করে আল-াহ তায়ালা বলেছেন–

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْ مُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ, তারা ঈমান আনছে না বলে আপনি আপনাকে হয়তো ধবংস করে দেবেন। (কাহাফ : ১২৮)

আমি তো মাঝে মধ্যে আমার সঙ্গীদেরকে এ কথাও বলি– দাওয়াত দেয়ার সময় যদি অভীষ্ট ব্যক্তি একটি প্রশ্ন করে উত্তর দিবেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন করলে তারও উত্তর দিবেন। তৃতীয় প্রশ্ন করলে কৌশলে প্রশ্নের ধারা সমাপ্ত করে ঘরে ফিরে আসবেন। আল-াহ তায়ালার কাছে দোয়া করবেন। হেড অফিস থেকে হেদায়েত মঞ্জুর করে নিবেন। সাধারণত যারা মানসিকভাবে মানতে অপ্রস্তুত থাকে তারাই বেশির ভাগ প্রশ্ন করে। অন্যথায় ‘কালেমা পড়’ বলাই যথেষ্ট হয়। শুধু এতটুকুর দ্বারা কত ব্যক্তি মুসলমান হয়েছে। পরে তাদের জীবন হয়েছে ঈর্ষণীয় উজ্জ্বল। আমি এক ব্যক্তির কথা উলে-খ করেছি। যে ব্যক্তি শুধু ‘কালেমা পড়’ দ্বারা মুসলমান হয়েছে। তারপর নিজের পরিবারের পেছনে কাজ করার মানসে তাকে পরিবারে বসবাস করাই কঠিন হয়ে পড়েছে। একবার সে আমার গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আমার কাছে চারটি দোয়া চেয়েছিল। তার সেই দোয়াই তার র্চি ও ঈমানবোধের পরিচয় বহন করে। সে বলেছিল, আমার জন্যে দোয়া করবেন। এক. আল-াহ তায়ালা যেন আমাকে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর মতো ঈমান নসীব করেন। দুই. আল-াহ তায়ালা যেন আমাকে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর মতো রাসূলে কারীম সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর ভালোবাসা নসীব করেন। তিন. আল-াহ তায়ালা যেন আমাকে আলেম বানান আর চার. আমার প্রতি

ভালো ধারণাবশত বলেছেন– আল-াহ তায়ালা যেন আমাকে কমপক্ষে আপনার মতো দা‘য়ী হিসেবে কবুল করেন।

এ কারণেই এই অধম সকল পথের সকল দা‘য়ীর সম্মান ও মূল্য যথাযথভাবে স্বীকার করে এবং মনে করে– সকলেই তাদের দ্বারা উপকৃত হওয়া উচিত। বিশেষ করে এই অধম তার সহকর্মীদের উদাত্ত আহ্বান জানায় তাদের দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্যে। সেই সাথে এই অধম নিজের জন্যে ‘কালেমা পড়’-এর পথকেই সঙ্গত মনে করে। আর যারা সাহস ও ভালোবাসা রাখে তাদের জন্যেও সঙ্গত মনে করে ‘কূলূ লা ইলাহা ইল-াল-াহ’- এর সংক্ষিপ্ত পন্থাকে।

প্রশ্ন : এর জন্যেও সংক্ষেপে কিছু বলতে হয়। কুরআনে কারীমের আয়াত পাঠ করতে হয়। তো এ ক্ষেত্রে কোনো বিষয়টাকে প্রাধান্য দেয়া আপনি বেশি যৌক্তিক মনে করেন।

উত্তর : আল-াহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনিই মানুষের প্রবণতাগুলো সবচে’ ভালো জানেন। কুরআন তাঁর কালাম। সুতরাং যেসব বিষয়কে কুরআন প্রাধান্য দিয়েছে, আমি মনে করি দাওয়াতের ক্ষেত্রে সেগুলোই প্রাধান্য দেয়া উচিত। বলার অপেক্ষা রাখে না, কুরআন প্রাধান্য দিয়েছে তাওহিদ রেসালাত এবং আখেরাতকে। এর মধ্যেও তাওহিদ ও রেসালাতকে বেশি গুর্ত্ব দেয়া হয়েছে। কুরআনে বার বার বেহেশ্ত দোযখের কথা বলা হয়েছে। এই আলোচনা মানুষকে অনেক বড় সিদ্ধান্ড় নিতেও উৎসাহিত করে, সাহস যোগায়। আখেরাতে নাজাতের ভিত্তিতেই ঈমান কবুলকারী ঈমানের উপর অটল থাকে। তাই অভীষ্ট ব্যক্তির সামনে বেহেশ্ত দোযখের আলোচনা যতটা করা যায় ততটাই ভালো। তোমার জানা আছে, ‘মরনে কে বাদ কিয়া হোগা’ বইটি শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্যে লেখা হয়েছিল। হিন্দিতে এর অনুবাদ হয়নি। বরং বর্ণমালার পরিবর্তন হয়েছে। ফলে যারা কেবল হিন্দি জানে, তারা এই বই পড়ে পুরোপুরি মর্ম উদ্ধারও করতে পারে না। তারপরও কত মানুষ এ পর্যন্ড় এ বই পড়ে মুসলমান হয়েছেন!

প্রশ্ন : মুসলমান হওয়ার পর সর্বপ্রথম কোনো বিষয়টির প্রতি নজর দেয়া উচিত?

উত্তর : সর্বপ্রথম কুফর এবং শিরক থেকে বেঁচে থাকার প্রতি নজর দিতে হবে। তারপর পবিত্রতার নিয়ম-কানুন এবং নামায ইত্যাদির প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। বুঝাতে হবে, আমরণ ঈমানের উপর অবিচল থাকার অপরিহার্যতা। তাকে বলতে হবে ঈমানের মূল প্রয়োজন তো পড়বে, মৃত্যুর পর। তারপর পরিবারের লোকদেরকে মুসলমান বানানোর জন্যে তাকে প্রস্তুত করতে হবে। একজন নওমুসলিমকে দা'য়ী বানিয়ে দেয়াটাই তার সকল সমস্যার সমাধান বলা যায়। সত্যি বলতে কি, আমরা নিজেরাও যদি দা'য়ী হয়ে যেতে পারি, তাহলে আমাদেরও সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : সাধারণভাবে মনে করা হয় এবং মনে হয় বাস্ড়বেও তাই ইসলাম এবং মুসলমানকে মানুষ ভয়ের দৃষ্টিতে দেখে। সুতরাং এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দাওয়াতের কাজ করা আশঙ্কাজনক। এই পরিস্থিতিতে স্পষ্ট ভাষায় দাওয়াত দেয়া কি হেকমতের পরিপন্থী নয়?

উত্তর : এই যে প্রতিকূলতা এবং শত্রুতা এর মূল কারণ হলো– আমরা দাওয়াত দেয়া ছেড়ে দিয়েছি। আমরা মানুষের প্রতি আমাদের কল্যাণকামিতা প্রমাণ করতে পারিনি। কল্যাণকামীদের জন্যে কোনো বিপদ নেই। আজ সকল প্রতিকূলতার ভিত্তি হলো তাদের অজ্ঞতা। যারা অমুসলিম, দীনের দাওয়াত তাদের অধিকার। কাউকে তার অধিকার না দেয়া অনেক জুলুম। জালেম সর্বদাই আল-াহ তায়ালার ক্রোধ ও গযবের শিকার হয়। আমরা যদি দাওয়াত না দিই তাহলে আল-াহ তায়ালার ক্রোধ ও গযবের আশঙ্কা রয়েছে। সুতরাং আশঙ্কা তো হলো দাওয়াত না দেয়ার ক্ষেত্রে। পক্ষান্ড়রে কেউ যদি দাওয়াত দেয়, তাহলে আল-াহ তায়ালার অঙ্গীকার রয়েছে–

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

অর্থাৎ, আল-াহই তোমাকে মানুষের হাত থেকে রক্ষা করবেন।

আল-াহ তায়ালার শোকরিয়া! তোমার জানা আছে, আমরা এই কাজ করে যাচ্ছি। তাছাড়া দাওয়াত দেয়া এটা আমাদের আইনি অধিকার। কেউ যদি বাধা দেয় তাহলে ভারতীয় আইনে সে অপরাধী হবে। সুতরাং এই কাজ না করার পেছনে ভয় থাকতে পারে, আশঙ্কা থাকতে পারে; করার ক্ষেত্রে আবার আশঙ্কার কথা আসছে কেন? আর যদি কোনো বিপদ আসেও তাহলে হযরত রাসূলে কারীম সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম এবং তাঁর সম্মানিত সঙ্গীগণ ঈমানের দাওয়াত দিতে গিয়ে যে বিসর্জন দিয়েছেন, ত্যাগ সয়েছেন, আমরাও সেই ত্যাগ ও বিসর্জনের সৌভাগ্য অর্জন করবো। আর বাস্ড়ব কথা হলো আল-াহ তায়ালা জানেন আমরা দুর্বল। আল-াহ তায়ালা কাউকে তার সামর্থ্যের বাইরে কখনও দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না।

প্রশ্ন : আলহামদুলিল-াহ! বিভিন্ন শ্রেণীর অনেক লোক দাওয়াতের কাজে সম্পৃক্ত হয়েছে। এখন তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং এই কাজকে গতিশীল করে রাখার উপায় কি বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : এই অধমের মত হলো– প্রতিটি ব্যক্তিকেই তার নিজস্ব অঙ্গনে নিজস্ব পদ্ধতিতে কাজ করতে দেয়া উচিত। উচিত প্রত্যেকের কাজকে স্বীকার করা। সামর্থ্য অনুযায়ী সহযোগিতা করা। অন্যের কাজের দ্বারা উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করা। অনেক সময় ঐক্যের পথে অধিক চেষ্টা উপকারী না হয়ে ক্ষতিকরও হতে পারে। আমাদের মতো কর্মীদের মাঝে এমনিতেও এখলাসের অভাব আছে। সবাই চাইবে আমার নেতৃত্বে কাজ হোক। দৃশ্যত এটা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এজন্যে উচিত, প্রত্যেকে নিজ নিজ জায়গায় থেকে কাজ করে যাওয়া। আর সামর্থ্য মাফিক অন্য যারা কাজ করছেন তাদেরকে সহযোগিতা করা। আমি মনে করি, পাস্পরিক ঐক্যের জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট।

প্রশ্ন : আপনি অনেক সময় বলে থাকেন, দা'য়ী এবং যাকে দাওয়াত

mv‡ne `v. ev.-Gi AvZ¥Rxebxg~jK mv¶vrKvi

দেয়া হচ্ছে তার মধ্যে পরস্পর আস্থাহীনতা দাওয়াতের ক্ষেত্রে একটি বড় অন্‍ড়রায়। বিশেষ করে মুসলমাদের নেতিবাচক মানসিকতা দাওয়াতের ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা। তো এর চিকিৎসা কী?

উত্তর : দা'য়ী এবং মাদউ অভীষ্ট ব্যক্তির মাঝে সম্পর্ক হলো চিকিৎসক এবং রোগীর মতো। চিকিৎসক যদি রোগীকে প্রতিপক্ষ এবং ষড়যন্ত্রকারী মনে করে তাহলে তো চিকিৎসার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এর আসল চিকিৎসা হলো বাস্‍ড়বে দাওয়াতের ময়দানে নেমে আসা। ময়দানে নেমে এসে যখন ইসলাম ও মুসলমানদের চূড়ান্‍ড় শত্রুকে দাওয়াত দেবে তখনই উপলব্ধি করতে পারবে এর শত্রুতার মূল ভিত্তি হলো অজ্ঞতা কিংবা ভুল ধারণা। আমাদের এক বন্ধু 'কিভাবে মুসলমান হলাম' শিরোনামে ছয়জন নওমুসলিমের ইন্টারভিউ সংকলন করেছেন। আরমোগান থেকেই। তারপর সেগুলো হিন্দিতে অনুবাদ করে ছাপিয়েছেন। একবার এক ব্যক্তি আমার মোবাইলে এসএমএম করলো। এসএমএস-এ সে লিখেছে, আমি বজরং দল এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দায়িত্বশীল। আপনার সাথে দেখা করবো। যখন সময় দিবেন তখন আপনার সাথে কথা বলবো। আমি তার সাথে কথা বললাম। কথায় মনে হচ্ছিল কোনো স্বামীজি। সে বললো, এক সময় এ্যাম্বুলেন্সেও কোনো মুসলমান আমার কাছে ভালো লাগতো না। কিন্তু 'কিভাবে মুসলমান হলাম' পড়ে আমার চিন্‍ড়া একেবারে বদলে গেছে। এরই মধ্যে আমি কুরআন মাজীদ পড়েছি। আমি পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করতে চাচ্ছি। বিশেষ করে মুসলমান হওয়ার পর আমাকে কী কী সংকটের মুখোমুখি হতে হবে।

আমি বলি, দাওয়াতের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েই বুঝা সম্ভব আমাদের সমস্যাটা কোথায়। আমাদের প্রচলিত নেতিবাচক চিন্‍ড়া দাওয়াতের ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার দ্বারাই ইতিবাচক এবং কল্যাণকর চিন্‍ড়ায় পনিণত হতে পারে।

প্রশ্ন. আপনি আপনার একটি রচনায় উলে-খ করেছিলেন,

ہرمرض کی دواکی ہے صل علی محمد

অর্থাৎ, 'সকল রোগের চিকিৎসা সালি- আলা মুহাম্মাদ'

সে লেখাটি পরে পুস্‍ড়িকা আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এতে আপনি উলে-খ করেছেন– পৃথিবীর সকল সংকটের সমাধান হলো দাওয়াত। কথাটি যখন আমরা বলি তখন মানুষ বলে- এটা বাড়াবাড়ি এবং দাওয়াতি উন্মাদনা। ইসলাম হলো মধ্যপন্থার ধর্ম। এখানে বাড়াবাড়ির অবকাশ নেই। এ সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

উত্তর : কোনো সন্দেহ নেই ইসলাম হলো মধ্যপন্থার ধর্ম। শুধু ইসলাম কেন, কোনো ক্ষেত্রেই বাড়াবাড়ি ঠিক নয়। কিন্তু আমাদের এই মধ্যপন্থার মাপকাঠি কি হবে এটাও ঠিক করা আছে। নইলে তো প্রতিটি মানুষই তার নিজের পথ ও চিন্‍ড়াকে মধ্যপন্থা বলে দাবি করবে। সত্যি বলতে কি, অতি সীমালজ্ঘনকারী ব্যক্তিও নিজেকে সীমালজ্ঘনকারী মনে করে না। মনে করে সেই ঠিক জায়গায় আছে। আমাদের জন্যে বাস্‍ড়ব জীবনে হযরত রাসূলে কারীম সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর আদর্শকে মধ্যপন্থার নমুনা হিসেবে চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং তাঁর আদর্শই হলো মধ্যপন্থার বাস্‍ড়ব চিত্র। আমরা যখন হযরত রাসূলে কারীম সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর সীরাত নিয়ে ভাবি তখন দেখি, প্রতিটি কল্যাণকর্মেই তিনি ছিলেন প্রতিযোগী। তাঁর নামাযের অবস্থা ছিল এই– রাতভর নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতেন। পা ফুলে যেতো। কিন্তু তাই বলে কেউ এসে তাঁকে এ কথা বলতে শোনা যায়নি, আপনি এত নামায কেন পড়ছেন? আপনাকে কি নামাযের পাগলামি পেয়েছে? তিনি রোযার পিঠে রোযা রাখতেন। কিন্‍ড়ু তাই বলে তাঁকে পাগল বলা হয়নি। দানশীলতা ছিল এমন, হাতে কখনও কোনো সম্পদ এলে বণ্টন শেষ না হওয়া পর্যন্‍ড় ঘরে যেতেন না। কোনো প্রার্থনাকারীকে ফিরিয়ে দিতেন না। ঋণ করে মানুষের প্রয়োজন মেটাতেন। ঋণপ্রার্থিরা তাঁকে কষ্ট দিতো। কিন্তু এ কারণে তাঁকে পাগল বলা হয়নি। অন্য কোনো কল্যাণকর্মে তাঁর এই প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতার কারণে তাঁকে কখনও পাগল বলা হয়নি। কুরআন শরীফে নয়বার 'জুনুন' পাগলামি শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। দুই বার ব্যবহার হয়েছে অন্য নবীর ক্ষেত্রে। সাতবার ব্যবহার হয়েছে

আমাদের নবী সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর ক্ষেত্রে। আর সেটাও দাওয়াতের ক্ষেত্রে তাঁর অস্থিরতা এবং মানুষ কেন মুসলমান হচ্ছে না এই চিন্ড়ায় তাঁর বিচলতার প্রেক্ষিতেই তাঁকে 'মাজনূন' এবং পাগল বলা হয়েছে। এতে এ কথাই প্রমাণিত হয়, হযরত রাসূলে কারীম সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর আদর্শের আলোকে ইসলামের মধ্যপন্থার দাবি হলো– দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রতিটি মুসলমানের মধ্যে এক ধরনের উন্মাদনা থাকতে হবে। মানুষকে কুফর শিরক এবং দোযখ থেকে বাঁচাবার অস্থিরতায় তাকে এতটাই বিচলিত হতে হবে মানুষ যেন তাকে বলতে বাধ্য হয়, একে দাওয়াতের উন্মাদনায় পেয়েছে। আমরা তো এই ভেবে বিস্মিত হই, এখনও তো কেবল মুখে দাওয়াত বলে চেঁচাচ্ছি। আহা! যদি আমাদের অন্ড়রাত্মায়ও হযরত রাসূলে কারীম সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর সেই দাওয়াতি অস্থিরতা-বিচলতা এবং উন্মাদনা প্রতিষ্ঠিত হতো! এই অধম দোয়া কবুলের বিশেষ জায়গাগুলোতে এবং বিশেষ সময়গুলোতে সর্বদা এই দোয়াই করি– আল-াহ তায়ালা যেন আমাদেরকে আমাদের নবীর মতো দাওয়াতি উন্মাদনা দান করেন।

প্রশ্ন : আমাদের বন্ধুরা যখন কোথাও যায়, তখন মাঝেমধ্যে তাবলীগি সাথীদের পক্ষ থেকে কিছু কিছু সংকটের মুখোমুখি হতে হয়। অনেকেই বলে, আমাদের মুরব্বীদের পক্ষ থেকে এর অনুমতি নিই। এ সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাই।

উত্তর : এ কথা আমি আগেও বলেছি, আমাদের মতো একেবারে শেকড়ছিন্ন তৃণলতাদের দাওয়াতের কাজে যুক্ত হওয়া অতঃপর আমাদের হাতে মানুষের ইসলাম গ্রহণে ধন্য হওয়া এটা একশ' ভাগ তাবলীগের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর নির্দেশনা এবং তাঁর কান্নাকাটির কারিশমা। আমার হযরত (রহ.) হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর সাথে যেসব আলেম কাজ করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম একজন। আমাদের হযরত বলতেন, হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) বাঙলাওয়ালী মসজিদ থেকে অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াতের কাজ করার

জন্যেই বেরিয়েছিলেন। তারপর মেওয়াতের লোকদের সাথে দেখা হয়। যারা ছিল আধা মুরতাদ। পরে তিনি তাদেরকেই সম্মিলিত দাওয়াতের ক্ষেত্র মনে করে তাদের মধ্যে কাজ করতে শুর“ করেন। তারপর মুসলমানদের মধ্যে দাওয়াতি প্রেরণা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে কাজ করতে আরম্ভ করেন। যাকে বরাবরই তিনি কাজের আলিফ বা বলতেন- এই অধম মনে করে অমুসলিমদের মধ্যে দাওয়াতের কাজ এটা বাঙালীওয়ালী মসজিদের কর্মসূচির তা ছা। আমি একশ' ভাগ বিশ্বাস করি, বাঙলাওয়ালী মসজিদ থেকেই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের কাছে এই কালিমা পৌঁছাবে। এই অধমের কাছে হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) এবং হযরত মাওলানা ইউসুফ (রহ.)-এর অসংখ্য চিঠির ফটো সংরক্ষিত আছে। সেসব চিঠিতে তাঁরা প্রত্যয়ের সাথে বলেছেন– আমাদের কাজ তো এখনও শুর“ই হয়নি। মানুষ যখন দলে দলে ইসলমা গ্রহণ করবে তখন বুঝবো আমাদের কাজ হচ্ছে।

একবার দিলি-র এক ইজতেমায় রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্ড় থেকে আসা দা'য়ীগণের মজলিসে এই অধমকে প্রশ্ন করা হয়েছিল– আপনি তাবলীগি জামাতের মুরব্বিগণকে অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াতের কাজ করতে বলেন না কেন? আমি তখন সত্য প্রকাশের খাতিরেই বলেছিলাম, এখন দুনিয়াব্যাপী যে দাওয়াতের পরিবেশ হয়েছে, মানুষ দলে দলে মুসলমান হচ্ছে এর অধিকাংশই এমন– যারা হয়তো সেচ্ছায় কিংবা ইসলামের বির“দ্ধে প্রোপাগা-ায় প্রভাবিত হয়ে ইসলামকে জেনে বুঝে মুসলমান হচ্ছে। অথবা তারা মুসলমান হচ্ছে মুসলমানদের দাওয়াতি প্রচেষ্টার বরকতে। আপনি যখন এ বিষয়টাকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করবেন তখন নিশ্চিত এই ফলাফলে উত্তীর্ণ হবেন, মুসলমানদের প্রচেষ্টায় যারা মুসলমান হচ্ছে তাদের অধিকাংশই হলো তাবলীগি জামাতের সাথীদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফসল। আর এটা হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর কাল থেকেই চলে আসছে। হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ)-এর সাথে ছায়ার মতো যারা থেকেছেন তাদের মধ্যে যে দুই ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর জীবন ও কর্ম পূর্ণাঙ্গ ভাবা যায় না, তাঁরা

হলেন– এক. মিয়াজী মূসা ও দুই. হাজী আব্দুর রহমান উটাওরভী (রহ.)। হাজী আব্দুর রহমান (রহ.) ছিলেন মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর পরম আস্থাভাজন এবং নওমুসলিম। তাঁর হাতে– এক বর্ণনায় চার হাজারেরও বেশি মানুষ মুসলমান হয়েছে। তাছাড়া কর্নেল আমির দ্দীনের মতো এমন অসংখ্য তাবলীগি কর্মী আছে যাদের হাতে বিশাল সংখ্যক মানুষ মুসলমান হয়েছে। এখনও যারা ইসলাম গ্রহণ করছেন তাদের দীনি তরবিয়ত ও প্রশিক্ষণের জন্যে তাবলীগ জামাতে পাঠানো ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই ।

আলহামদুলিল-াহ! মারকাযের সকল মুরব্বি এই অধমের জন্যে এবং তার সহকর্মীদের জন্যে বরাবর দোয়া করেন। সাক্ষাতের বিশেষ বিশেষ স্থানে, সময়ে আমাদের জন্যে সর্বদাই দোয়া করেন। ট্রেনে-বাসে-স্টেশনে- বাসস্টেশনে যে তালিম হয় তাতে অমুসলমানদেরকেও শামিল করার কথা ইজতেমাগুলোতে আমাদের বুযুর্গগণ এখন বলছেন। হয়তো ভুল বুঝার কারণে কোথায় কোনো বিরোধিতার ঘটনাও ঘটতে পারে। সেটা তো নিজেদের সহকর্মীদের মধ্যেও নানা সময়ে নানা কারণে ঘটে থাকে। এটা এমন বলবার কথা কী হলো!

প্রশ্ন : অনেকেই বলে– আগে আমাদের সংশোধন দরকার । আমরা মুসলমান হয়ে যখন ঠিক হতে পারি নি, খুদ আমাদের মধ্যেই যখন মানুষ মুরতাদ হচ্ছে তখন অন্যদের নিয়ে ভাবনার সুযোগ কোথায়? এই ধরনের প্রশ্ন সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

উত্তর : এটা একটা দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ বিষয়। এ জন্যে আমি আরমোগানে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছি। আমার সেসব প্রবন্ধ এখন গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হয়েছে। শিরোনাম–

دعوت دین: کچھ غلط فہمیاں کچھ حقائق

অর্থাৎ, দীনি দাওয়াত: কিছু ভুল ধারণা কিছু বাস্তবতা

এতে আমি এ জাতীয় সকল প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করেছি। এও বলার চেষ্টা করেছি, পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়া ধর্মত্যাগী ফেতনার একমাত্র

সমাধান হলো, এই উম্মতের মধ্যে দাওয়াতের চেতনাকে জাগিয়ে তোলা। লেখাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আশা করি এটা পাঠ করার পর এ বিষয়ে কোনো সংশয় অবশিষ্ট থাকবে না। উলামায়ে কেরাম রচনাটিকে পছন্দ করেছেন। অনেকেরই এটা পাঠ করার পর মনের সকল প্রশ্ন দূর হয়ে গেছে।

প্রশ্ন : রমযান মাসে আমাদের দাওয়াতের কী কর্মসূচী থাকা উচিত বলে মনে করেন।

উত্তর : এই মাসকে আল-াহ তায়ালা কুরআন অবতীর্ণ করার মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। সুতরাং এটা হলো শাহী দানের মওসুম। সমগ্র মানব জাতির জন্যে পথনির্দেশিকা হিসেবে অবতীর্ণ কুরআনের বরকত অর্জনের মাস এটা। এটা দা'য়ীদের জন্যে তাদের টার্গেট স্থির করার মাস। বিশেষ করে আল-াহ তায়ালার কাছে মনের প্রার্থনাকে মঞ্জুর করে নেয়ার মাস। এজন্যে উচিত, এই মাসে নিজের জন্যে দা'য়ী হবার মর্যাদা আল-াহ তায়ালার কাছে চেয়ে নেয়া। আল-াহ তায়ালা যখন মঞ্জুর করে নেন তখন উপায় উপকরণ এমনকি ঈমান এবং অন্তরের ব্যাকুলতাও আল-াহ তায়ালাই দান করেন। এজন্যে পুরো বিশ্বাস এবং দরদের সাথে আল-াহ তায়ালার দরবারে দোয়া করা উচিত।

প্রশ্ন : দাওয়াতের ময়দানে দা'য়ীর জন্যে সবচে' লক্ষণীয় বিষয় কোনটি? কোনো বিষয়টি তার জন্যে সর্বাধিক উপকারী বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : এক কথায় সকলের জন্যে জবাব দেয়া সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সকলের জন্যেই আলাদা উত্তর হতে পারে। এক্ষেত্রে এই অধমের অভিজ্ঞতা হলো– দাওয়াত হলো নবীগণের কাজ। এই কাজের মহত্ত্ব ও বড়ত্বের পাশাপাশি নিজের অযোগ্যতা এবং ক্ষুদ্রতার কথা যত বেশি মনে থাকবে তত বেশি আল-াহ তায়ালা পথ খুলে দিবেন। মানুষ নিজের অযোগ্যতা ইলম ও আমলের ক্ষুদ্রতার উপলব্ধি যত প্রখরভাবে অনুভব করে ততই তার কান্নাকাটি এবং মুনাজাতের তাওফিক হয়। মানুষের

mv‡ne `v. ev.-Gi AvZ¥Rxebxg~jK mv¶vrKvi

কাছে তো দোয়া আর মুনাজাত ছাড়া আর কোনো আশ্রয় নাই। মানুষ যত বেশি পরম বিনয়ের সাথে মুনাজাত করে ততই আল-াহ তায়ালার পক্ষ থেকে দানের ফয়সালা হয়। এই বরকতপূর্ণ মাস তো হলো আল-াহ তায়ালার কাছে প্রার্থনার মাস। সকল বাদশাহর বাদশাহ মহান আল-াহ তায়ালার মহান দরবারে উপস্থিত হওয়ার মুখও তো আমাদের নেই। শুধুমাত্র মুখাপেক্ষিতার অনুভূতি আর এতেকাফের বাহানায় নিজেকে এই দুয়ারে ফেলে রাখি। কারণ, এই দুয়ার ছাড়া উদ্দেশ্যসাধনের আর তো কোনো দুয়ার নেই। আমাদের প্রয়োজন বরকতময় এই মাসের সুযোগকে কাজে লাগানো।

প্রশ্ন : আরমোগানের পাঠকদের উদ্দেশে আপনার কোনো বার্তা?

উত্তর : এই দেশ মহব্বত ওয়ালাদের দেশ। আল-াহ তায়ালা সর্বোত্তম রূপ ও অবয়বে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। ভালোবাসাপ্রবণ এই জাতিকে শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যে সাজানো হয়েছে। আল-াহর উত্তম সৃষ্টি এই মানুষের প্রতি নিরাশ না হয়ে বরং মানুষের সত্তায় নিহিত সৌন্দর্যকে প্রকাশ করার জন্য প্রেম ও ভালোবাসা নিয়ে দাওয়াতের ময়দানে অবতীর্ণ হওয়া উচিত। এখানে দাওয়াতের জন্যে যোগ্যতার প্রয়োজন নেই। বরং প্রয়োজন সাহস ও ভালোবাসার। প্রয়োজন হেদায়েতের জন্যে তৃষ্ণার্ত মানবতার ঠোঁটে হেদায়েতের ঠা-া পানির পেয়ালাটুকু লাগিয়ে দেয়া। যদি কেউ এই আবেগ নিয়ে দাওয়াতের ময়দানে অবতীর্ণ হয়, তাহলে সকল নিরাশা আশায় উজ্জীবিত হয়ে উঠবে ইনশাআল-াহ।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

মাওলানা ওমর নাসেহী

মসিক আরমুগান, মে ও জুন ২০১০ইং

হিলফুল ফুযুল প্রকাশনীর প্রকাশিত কয়েকটি বই

- **আলোর পথে সিরিজ-১**
  মূল : মাওলানা কালীম সিদ্দিকী, অনুবাদ: মুফতি যুবায়ের আহমদ
- **আলোর পথে সিরিজ-২**
  মূল : মাওলানা কালীম সিদ্দিকী, অনুবাদ: মুফতি যুবায়ের আহমদ
- **আলোর পথে সিরিজ-৩**
  মূল : মাওলানা কালীম সিদ্দিকী, অনুবাদ: মুফতি যুবায়ের আহমদ
- **দ্বীদেনর দাওয়াত কিছু প্রশ্ন কিছু কথা**
  মূল: মাওলানা কালীম সিদ্দিকী, অনুবাদ: মাওলানা জামিল আহমদ
- **মুক্তি কোন পথে**
  মুফতি যুবায়ের আহমদ
- **নবীজীর আদর্শ ও আমাদের জীবন বাস্ড়বতা**
  মূল : মাওলানা কালীম সিদ্দিকী, অনুবাদ: মুফতি যুবায়ের আহমদ
- **নিজে বাঁচুন পরিবারকে বাঁচান**
  শেখ মোহাম্মদ আব্দুল হাই
- **বড় দিনের উপহার**
  মুফতি যুবায়ের আহমদ
- **হিন্দু ভাইদের দাওয়াত দেয়ার পথ ও পদ্ধতি**
  মুফতি যুবায়ের আহমদ
- **সহযোগী হও প্রতিপক্ষ হয়ো না**
  মূল : মাওলানা কালীম সিদ্দিকী, অনুবাদ: মুফতি যুবায়ের আহমদ
- **বাংলা নববর্ষ অজানা বৈশাখ**
  মুফতি যুবায়ের আহমদ

প্রকাশের পথে

- **বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের তৎপরতা ও আমাদের করণীয়**
  মুফতি যুবায়ের আহমদ
- **আলোর পথে সিরিজ-৪**
  মূল : মাওলানা কালীম সিদ্দিকী, অনুবাদ: মুফতি যুবায়ের আহমদ
- **হাদিয়ায়ে দাওয়াত**
  মূল : মাওলানা কালীম সিদ্দিকী, অনুবাদ: মুফতি যুবায়ের আহমদ
- **তুহফায়ে দাওয়াত**
  মূল : মাওলানা কালীম সিদ্দিকী, অনুবাদ: মুফতি যুবায়ের আহমদ